

অহিংসা পরম ধর্ম



এক খড়্গী গণ্ডার অসমের সম্পদ,

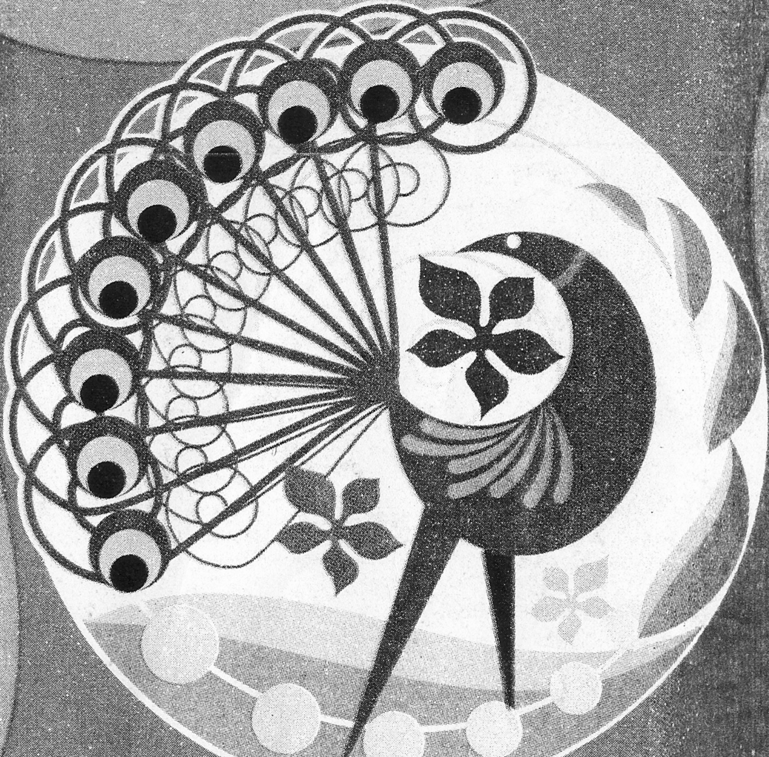
এই গণ্ডার হত্যাকারীরা অসমের শত্রু

অনুগ্রহপূর্বক মুদ্রিত মূল্যের বিনিময়ে বই ক্রয় করবেন

Class-09

সাহিত্য সৌরভ

নবম শ্রেণির জন্য



প্রস্তুতকরণ ঃ আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ

দ্য আসাম স্টেট টেক্সটবুক প্রোডাকশন অ্যান্ড
পাবলিকেশন করপোরেশন লিমিটেড, গুয়াহাটি

সাহিত্য-সৌরভ

(নবম শ্রেণির জন্য)

সংকলন ও প্রস্তুতকরণ

মিহির মজুমদার

চিত্তরঞ্জন দত্ত

আরতি লাহিড়ি

পুনরীক্ষক

ড° অমলেন্দু চক্রবর্তী

Bharatavani

Book No.-20

Sahitya-Sourav

- Bengali Language-

দ্য আসাম স্টেট টেক্সটবুক প্রোডাকশন অ্যান্ড পাবলিকেশন

করপোরেশন লিমিটেড

গুয়াহাটি, অসম

SAHITYA-SOURABH : A Textbook on Bengali MIL for class ix, prepared and approved by the Board of Secondary Education, Assam and published by The Assam State Textbook Production and Publication Corporation Limited, Guwahati.
Price : Rs. 38.00 (Rupees thirty eight)only.

All rights reserved : No reproduction in any form of this book, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from the publisher.

Copyright : The Assam State Text Book Production and Publication Corporation Limited, Guwahati

প্রথম প্রকাশ : ২০১৩

মূল্য : ৩৮.০০ টাকা
(অনুগ্রহ করে মুদ্রিত মূল্যের বিনিময়ে বই কিনবেন)

প্রকাশক : দ্য আসাম স্টেট টেক্সটবুক প্রোডাকশন অ্যান্ড পাব্লিকেশন করপোরেশন লিমিটেড গুয়াহাটি, অসম

মুদ্রণ : সিটি অফসেট,
আদাবাড়ি তিনি আলি,
গুয়াহাটি—৭৮১০০৩

ভূমিকা

হালে প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির আধারে আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রমের মান উন্নত করা হয়েছে। এই নবায়িত পাঠক্রম অনুসারে অসমের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রণীত হয়েছে। মুদ্রণ এবং প্রকাশনায় নিখুঁত মান অক্ষুণ্ণ রেখে সঠিক সময়ে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া 'অসম রাজ্যিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন আরু প্রকাশন নিগম লিমিটেড'-এর প্রধান লক্ষ্য। এই পুস্তক পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে মনে করব। পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত কোনো ভুল ভ্রান্তি সদাশয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করবেন। আমরা বাধিত থাকব। এবং সেইসব ত্রুটি বিচ্যুতি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেবার যত্ন নেব।

বিনন্দ কুমার শইকিয়া
অধ্যক্ষ
অসম রাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্রণয়ন আরু
প্রকাশন নিগম লিমিটেড, গুয়াহাটি।

প্রাকভাষ

'অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ' ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর করার জন্য নতুন পাঠক্রমের আধারে বাংলা মাধ্যমের নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'সাহিত্য-সৌরভ' নামক পুস্তকখানি প্রস্তুত করেছে। প্রতিটি পাঠের শেষে অনুশীলনের জন্য নানা ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠসমূহের বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত করার পক্ষে তা উপযোগী। এতে আশা করি শিক্ষার্থীদের শ্রম লাঘব হবে।

পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

এই পাঠ্যপুস্তকে অজ্ঞাতসারে থেকে যাওয়া ভুল-ত্রুটি সদাশয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টিগোচর হলে, নির্ভুল পরিষ্কার জন্য, গঠনমূলক পরামর্শ তাঁরা পরিষদকে জানালে বাধিত হব।

বামুনিমৈদাম গুয়াহাটি

হেমন্ত কুমার শালৈ
সচিব
অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ
গুয়াহাটি ৭৮১০২১

সূচীপত্র

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা

মুরারি গুপ্ত
ষোড়শ শতক

শচীর আঙিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি।।
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লালে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধুলামাখা সর্ব গায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপর লয় তুলি।
কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি।।

মুরারি গুপ্ত : কবি পরিচিতি



মুরারি গুপ্ত ষোড়শ শতকের (১৫০১—১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) একজন বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং লেখক। তিনি বাংলাদেশের সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি নবদ্বীপে চলে আসেন এবং বাকি জীবন সেখানে অতিবাহিত করেন। পেশায় তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ছিলেন। মুরারি গুপ্ত ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। সংস্কৃতে লিখিত এই চৈতন্যজীবনী কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। এতে চৈতন্যের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে খ্যাত। এটি শ্রীচৈতন্যের প্রামাণ্য জীবনী হিসেবেও সর্বজন মান্য।

পাঠ প্রসঙ্গ

'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা' পাঠে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বাল্যকালের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন বৈষ্ণবকবি। এই বর্ণনাগুলো কাল্পনিক। বাংলাদেশে এবং অন্যত্রও চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসেবে পূজিত। এই পূজা কেবল বৈষ্ণবরাই করেন এমন নয়, আরও অনেকে করেন।

কবি তথা পদকারগণ পরম বৈষ্ণব এবং ভক্ত। গৌরাঙ্গের লীলার কথা এই সকল ভক্ত বৈষ্ণব কবিদের রচনায় নানা ভাবে ও রসে পরিবেশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে বৈষ্ণব সাহিত্য। নানা রূপে রসে তাৎপর্যে তা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে।

আমাদের পাঠ্য 'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা'র পদটিতে কবি চৈতন্যদেবের শিশুকালের বর্ণনা দিয়েছেন। শিশু গৌরাঙ্গ হামাগুড়ি দিচ্ছেন, হাঁটতে শিখছেন। তাঁর চাঞ্চল্য মায়ের উৎকণ্ঠার কারণ। হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলেই স্নেহকাতর মা তাঁকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। এই চিরন্তনী মায়ের স্নেহ-বুভুক্ষা মুরারি গুপ্তের পদটিতে বড় হৃদয়গ্রাহী হয়ে ধরা দিয়েছে। যেহেতু কবি জানেন এ ছেলে কোলের ছেলে নয়।

এই পাঠের সাহায্যে গ্রামবাংলার গৃহকোণ, আঙিনা ও মমতাময়ী মায়ের স্নেহ-বৎসলতার চিরন্তন রূপ ছাত্রছাত্রীর মনে আনন্দ সঞ্চার করবে।

শব্দার্থ

আঙিনা— অঙ্গন, উঠোন।

গোরাচাঁদ— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরেক নাম।

দোলে— ঝোলে, দোল খায়।

বিজুলি— বিদ্যুৎ, তড়িৎ।

সন্ন্যাসী— সংসার-বাসনা-হীন, গৃহত্যাগী, পরমেশ্বরে নিবেদিত প্রাণ।

ভুবনমোহন— ভুবন অর্থ পৃথিবী। ভুবনমোহন মানে পৃথিবীকে যে মোহিত করে। এখানে— শ্রীকৃষ্ণ।

হামাগুড়ি— শিশুর চলার ভঙ্গি। হাঁটু ও হাতের চেটোর সাহায্যে চলন।

লালে— লালায়, মুখনিঃসৃত রসে।

গোরা— গোরাচাঁদ, শ্রীচৈতন্যের অপর নাম। ফর্সা। যার অঙ্গের কান্তি উজ্জ্বল।

টীকা

গোরাচাঁদ *অথবা* শ্রীচৈতন্যদেব



নদীয়া জেলার নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র। এবং মাতা শচী দেবী। এঁরা শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রকৃত নাম হল বিশ্বম্ভর। ডাক নাম নিমাই। কৃষ্ণচৈতন্য নামেই তিনি পরিচিত। বৈষ্ণব-ভক্তি-ধর্মের প্রবক্তা। তিনি তাঁর স্বকীয় ভক্তির মাধ্যমে বাংলা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। বৈষ্ণব বংশ পরম্পরার পঞ্চম পর্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব চৈতন্যদেবের ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই মহাত্মার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

শচী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জননী। তাঁর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। শচীর সন্তান-স্নেহের পরাকাষ্ঠা বৈষ্ণব সমাজে নানাভাবে কীর্তিত। শচী ও চৈতন্যকে নিয়ে বৈষ্ণব কবিগণ অসংখ্য পদ রচনা করে গেছেন।

ক। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

(১) 'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা' পদটি কার রচনা?
ক. গোবিন্দদাসের খ. বলরামদাসের গ. চণ্ডীদাসের ঘ. মুরারি গুপ্তের।

(২) গৌরাঙ্গের গলে দোলে—
ক. বাঘনখ খ. সিংহের নখ গ. কুকুরের দাঁত ঘ. ময়ুরের পাখা।

(৩) গোরাচাঁদ কার নাম?
ক. শ্রীচৈতন্যের খ. শচীর গ. মুরারি গুপ্তের ঘ. শ্রীকৃষ্ণের।

(৪) গৌরাঙ্গের মায়ের নাম—
ক. মীরা খ. রাধা গ. শচী ঘ. সারদা।

খ। প্রশ্নগুলোর অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

১. শ্রীচৈতন্যের পিতার নাম কী?
উ. জগন্নাথ মিশ্র

২. শ্রীচৈতন্যের জন্ম কোথায় এবং কত সালে হয়েছিল?
উ. ১৪৪৯ সালে, নবদ্বীপে।

৩. শ্রীচৈতন্যের আসল নাম কী?
উ. বিশ্বম্ভর

৪. শ্রীচৈতন্যের অন্য একটি নাম বলো।
উ. গৌরাঙ্গ

৫. শ্রীচৈতন্যের মায়ের নাম কী?

গ। প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

ক. শ্রীচৈতন্যকে গোরাচাঁদ কেন বলা হয়?
খ. গৌরাঙ্গের সাজসজ্জার বিবরণ দাও।
গ. গৌরহরি কে?
ঘ. 'সহিতে কি পারে মায়'— এখানে মা কে?

ঘ। দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও।

ক. গৌরহরি কে? তিনি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন?
খ. 'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা' অবলম্বনে শিশু গৌরাঙ্গের বিবরণ দাও।
গ. 'কাঁদিয়া আকুল'— এখানে কে এবং কেন কেঁদে আকুল হয়েছেন?
ঘ. 'এ নহে কোলের ছেলে'— ভাষ্যটি কার? তাঁর এমন ভাষণের যুক্তি দর্শাও।

ঙ। দশটি বাক্যে উত্তর দাও।

১. 'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা' অবলম্বনে শিশু গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার বিবরণ দাও।

২. 'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা' কবিতাটির সার-সংক্ষেপ করো।

চ। রচনাধর্মী উত্তর লেখো।

১. 'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা' কবিতার ভাবার্থ তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

২. 'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা' কবিতা অবলম্বনে শিশু শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার অনুপুঙ্খ বিবরণ দাও।

৩. 'সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি'— উক্তিটি কার? তাঁর এমন ধারণার কারণ সবিস্তারে বিশ্লেষণ করো।

ছ। শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করো।

ক. বাল্যকালে গৌরাঙ্গ সিংহের নখ গলায় পরতেন।

খ. হাসিয়া মুরারি শচীর কোলে চড়লেন।

জ। শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক. — সর্ব গায় সহিতে কি পারে মায়।

খ. হাসিয়া — বোলে এ নহে কোলের ছেলে।

গ. শচীর — মাঝে ভুবনমোহন সাজে। (সঠিক শব্দ নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো।)
(কোলের/ বুকের/আঙিনা)

ঝ। ব্যাকরণ।

১. আঙিনা। তৎভব শব্দ। সংস্কৃত শব্দ অঙ্গন থেকে এসেছে। পাঁচটি তদ্ভব শব্দ লেখো।

২. 'গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা' কবিতাটি থেকে ক্রিয়াপদগুলো বাছাই করে লিখ। যেমন— চলে, ভাসি, ইত্যাদি।

৩. ধ্বন্যাত্মক শব্দ লেখো। যেমন— গুড়িগুড়ি। তোমাদের জানা আছে এমন দশটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ লেখো।

৪. কবিতাটি থেকে বিশেষ্য বা নামবাচক শব্দগুলি বাছাই করো। যেমন— আঙিনা, শচী, মুরারি ইত্যাদি।

৫. কবিতাটির বিশেষ্য শব্দগুলির সঙ্গে নির্দেশক প্রত্যয়— টা, টি, খানা, খানি, ইত্যাদি যোগ করো।
যেমন— আঙিনা = আঙিনাটি, আঙিনাখানা, আঙিনাখানি।
কিন্তু ব্যক্তিনাম যেমন— শচী, মুরারি-র সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হবে না। এই কথা লক্ষ রেখো।

৬. তিনটি স্ত্রী-প্রত্যয় লেখো। শব্দে তার ব্যবহার দেখাও। যেমন— নী, নি
কামার (পুং লিঙ্গ) — কামারনি (স্ত্রীলিঙ্গ)

লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়ম

বাংলা ভাষায় তিনটি উপায়ে পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা যায়। একে লিঙ্গান্তরও বলে। লিঙ্গ পরিবর্তন করা যায় এই তিনটি উপায়ে— (১) পৃথক শব্দযোগে (২) স্ত্রীবাচক শব্দযোগে এবং (৩) প্রত্যয়যোগে।

১. পৃথক শব্দযোগে লিঙ্গান্তর

ক. বাংলা শব্দ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা, বাপ	মা
দাদা	দিদি
ষাঁড়	গাই
এঁড়ে	বক্না
ঠাকুরদা	ঠাকুরমা, ঠানদি
ভাশুর, দেওর	জা
ভাই	বোন, ভাজ
দাদু	দিদিমা
ঠাকুরজামাই	ঠাকুরঝি
শ্বশুর	শাশুড়ি
বেয়াই	বেয়ান

খ. সংস্কৃত শব্দ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পুরুষ	নারী
ভ্রাতা	ভগ্নী
বর	বধূ
পতি	পত্নী
কর্তা	গৃহিণী, গিন্নি

গ. বিদেশী শব্দ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গোলাম	বাঁদি
চাকর	ঝি, চাকরানি
খানসামা	আয়া
সাহেব	বিবি, মেম

২. স্ত্রীবাচক শব্দযোগে লিঙ্গান্তর

(শব্দের আগে বা পারে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়।)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গোঁসাই	মা-গোঁসাই
কবি	মহিলা-কবি, স্ত্রী-কবি
পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ
বেটাছেলে	মেয়েছেলে

৩. প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর

বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয় প্রধানত দুটি---- (১) ঈ (পত্নী ও স্ত্রীজাতি অর্থে) ও (২) ন্-জাত নী, নি, আনী, ইনী, উনি ইত্যাদি। পুংলিঙ্গ শব্দের সঙ্গে এ সব প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করা হয়।

ক. ঈ-যোগে বাংলা পুংলিঙ্গ শব্দের রূপান্তর

(পত্নী অর্থে)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
খুড়া	খুড়ি
জেঠা	জেঠি
নানা	নানি
শ্বশুর	শাশুড়ি

(স্ত্রী-জাতি অর্থে)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বুড়া	বুড়ি
ভেড়া	ভেড়ি
চখা	চখি
ছাত্র	ছাত্রী

খ. -নী, -নি, -আনী ইত্যাদি যোগে

* -নী, -নি যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কামার	কামারনি
কলু	কলুনি
জেলে	জেলেনি
মাস্টার	মাস্টারনি
মেছো	মেছোনি, মেছুনি
মজুর	মজুরনি

-আনী যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চাকর	চাকরানি
মেথর	মেথরানি
নাপিত	নাপিতানি
চৌধুরী	চৌধুরানি

* -ইনি যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাঘ	বাঘিনি
কাঙাল	কাঙালিনি
সাপ	সাপিনি
ভিখারি	ভিখারিনি

গ. তৎসম পুংলিঙ্গ শব্দের লিঙ্গান্তর

* আ-যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অশ্ব	অশ্বা
আর্য	আর্যা
চপল	চপলা
দীন	দীনা
নবীন	নবীনা
নিপুণ	নিপুণা

৯. প্রকল্প রচনা করো। যে কোনো পাঁচজন বৈষ্ণবকবির (যেমন— বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, যদুনন্দন, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ) বিষয়ে যা জান লেখো। প্রত্যেকের একটি করে পদ সংযোজন করবে।

কাশীরাম দাস

মধুসূদন দত্ত
(১৮২৪—১৮৭৩)

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পূণ্যবান।।

কবি পরিচিতি



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বর্তমান বাংলাদেশের কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবি মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত; মাতার নাম ছিল জাহ্নবী দেবী। শৈশবে মধুসূদন গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। বালক মধুসূদন মায়ের কাছেই রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন গল্প শুনেছেন। বালক মধুসূদন ১৮৩৩ সালে সপরিবারে কলকাতার খিদিরপুরে চলে আসেন। এখানে পিতা রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে হিন্দু কলেজের জুনিয়র ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯ বছর বয়সে মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে মেধাবী ছাত্র হিসেবে মধুসূদনের বেশ সুনাম ছিল। এরপর তিনি মাদ্রাজ চলে যান। মাদ্রাজ থাকাকালীন ১৮৪৮ সালের ৩১ জুলাই রেবেকা ম্যাকটাভিস্‌কে বিবাহ করেন। তাঁর এ

বিবাহ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী মিলি হেনরিয়েটাকে নিয়ে ১৮৫৬ সালে কবি কলকাতায় চলে আসেন। এখানেই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে নাটক— শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী। কাব্য— মেঘনাদবধ-কাব্য, ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, বীরাঙ্গনা-কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী উল্লেখযোগ্য। কবি মধুসূদন ছিলেন বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ। কবি ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন মৃত্যুবরণ করেন।
আলোচ্য কবিতাটি কবির চতুর্দশপদী কবিতাবলী গ্রন্থের অন্তর্গত।

আলোচ্য পাঠটিতে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মহাগ্রন্থ, মহাকাব্য 'মহাভারত' মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। এই সংস্কৃত 'মহাভরত' বাংলা ভাষায় যাঁরা পদ্যানুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কাশীরাম দাস অন্যতম। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' গ্রন্থখানি বাঙালির আদরের সামগ্রী। এ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর মানস তৃষ্ণা তৃপ্ত করেছে এবং সমগ্র ভারতবাসীর মনোরাজ্যকে জয় করেছে। তাই এ গ্রন্থের আবেদন ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে আমাদের বর্তমান সংকলনে পাঠটি গৃহীত হয়েছে।

শব্দার্থ

চন্দ্রচূড়— চূড়ায় চন্দ্র যার। মহাদেব, শিব। জাহ্নবী— গঙ্গার অপর এক নাম। ভারত-রস— মহাভারত কাব্যের রস। স্ববলে— নিজের শক্তিতে, স্ব-শক্তিতে। গৌড়ের— গৌড় প্রাচীন বাংলার নাম। কবীশ — কবিশ্রেষ্ঠ। দ্বৈপায়ন— দ্বীপে জন্ম যার। রোদন— ক্রন্দন, বিলাপ, কান্না। খননি— খনন করে যে। তৃষ্ণা— পিপাসা, তিয়াসা, তেষ্টা।

টীকা

সগর বংশ

পুরাণ-খ্যাত বংশ বিশেষ। সগর বংশে জন্মেছেন ভগীরথ। সগররাজের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অন্বেষণ কালে সগর রাজের ষাট হাজার পুত্র কপিলমুনিকে অপমান করে। ফলে মুনির অভিশাপে সকলে ভস্মীভূত হয়। ভগীরথ কঠোর তপস্যা করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করলে গঙ্গার পবিত্র জলের স্পর্শে সগর সন্তানরা মুক্তি লাভ করে।

দ্বৈপায়ন

ব্যাসদেবের অপর নাম দ্বৈপায়ন। পরাশর মুনির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভস্থ এই সন্তান দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাঁর নাম হয়েছিল দ্বৈপায়ন। ইনি ব্যাসদেব নামেই সংসারে সুখ্যাত। মহর্ষি ব্যাসদেব সংস্কৃতে মহাভারত রচনা করেছিলেন। এই মহাভারত ভারতবাসীর মহাকাব্য।

কাশীরাম দাস

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মহাভারত বাংলা ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন কাশীরাম দাস। কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাভারতই বাঙালির আদরের সামগ্রী। এই গ্রন্থ পাঠ করেই বাঙালি, মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। কবি পশ্চিমবঙ্গের কাটোয়ার সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত। কবি তাঁর গুরু অভিরাম মুখোটির পরামর্শে মহাভারত রচনা করেন। তাঁর কাব্য আনুমানিক ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল।

ভগীরথ

ইক্ষাকু বংশীয় রাজা। দিলীপের পুত্র। হিমালয়ে গিয়ে ভগীরথ বহু বছর গঙ্গা দেবীর আরাধনা করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য। তাঁর পূর্বপুরুষ ষাট হাজার সগর-পুত্রদের ভস্মাবশেষ জলসিক্ত করার জন্য তিনি গঙ্গার ধ্যান করেন। তাঁর সাধনায় প্রীত হয়ে গঙ্গা মর্ত্যে প্রবাহিত হতে সম্মত হন। শর্ত কেবল এই, শিব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করবেন। হিমালয় কন্যা গঙ্গা তখন শিবের মস্তকে পতিত হয়ে ত্রিধা বিভক্ত হলেন। ভগীরথের এই কীর্তিগাথা লোমশমুনি পাণ্ডবদের শুনিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

পাঠের বক্তব্য বিষয়

'কাশীরাম দাস' কবিতাটির রচয়িতা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কবি এখানে সংস্কৃত 'মহাভারত', বাংলা ভাষায়-পদ্যানুবাদকারী কবি কাশারীম দাসের প্রশস্তি রচনা করেছেন। মধুসূদনের প্রশস্তিমূলক রচনার মধ্যে আলোচ্য কবিতাটি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে কোনো সংশয় নেই। বাংলা ভাষায় রচিত মহাকাব্য মহাভারতের পুণ্যকাহিনি। সেই কাব্য রচনা করে কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর মানসতৃষ্ণা দূ র করেছেন।

তাঁর এ কীর্তি কঠোর ব্রতী ভগীরথের, স্বর্গের মন্দাকিনী ধারাকে মর্ত্যে আনয়ন করার সঙ্গে তুলনীয়। কবি মধুসূদন কাশীরাম দাসের কীর্তিকে এক বিশ্বহিত ব্রতী তপস্বীর তপস্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রচনাটি কবি মধুসূদনের এক অনন্য সৃষ্টি। কবি হৃদয়ের শ্রদ্ধাপ্লুত প্রশস্তির গভীর আলোড়ন কবিতাটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রিয়া কলাপ : (ভাব বিষয়ক)

১. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

(ক) বাংলা ভাষায় 'মহাভারত' মহাকাব্য রচনা করেন—
(১) মধুসূদন (২) কাশীরাম দাস (৩) কৃত্তিবাস ওঝা (৪) জীবনানন্দ দাশ

(খ) গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আনয়ন করেছিলেন—
(১) ব্যাসদেব (২) শিব (৩) ভগীরথ (৪) সগররাজ

(গ) জাহ্নবী শব্দের অর্থ হল—
(১) গঙ্গা (২) যমুনা (৩) ব্রহ্মপুত্র (৪) সিন্ধু।

(ঘ) মধুসূদন কোন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?
(১) বৌদ্ধধর্ম (২) খ্রিস্টধর্ম (৩) শিখ ধর্ম (৪) ইসলাম ধর্ম।

২. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(ক) জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি———

(খ) কঠোর গঙ্গায় পূজি——— ব্রতী

(গ) ——— কথা অমৃত-সমান।

(ঘ) হে কাশি——— তুমি পুণ্যবান।

(ঙ) নারিবে শোধিতে ধার কভু———।

৩. গদ্যরূপ লেখো।

রাখিলা, আছিলা, সাধিলা, শোধিতে, নারিবে, পবিত্রিলা।

৪. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।

(ক) 'কাশীরাম দাস' কবিতাটির কবি কে?

(খ) কবিতাটি কবির কী ধরনের কবিতা?

(গ) কাশীরাম দাস কে ছিলেন?

(ঘ) কবীশ দলে কবির মতে পুণ্যবান কে?

(ঙ) স্বর্গের মন্দাকিনী ধারাকে কে মর্ত্যে আনয়ন করেছেন?

(চ) ভগীরথ কোন রাজবংশের রাজপুত্র ছিলেন?

(ছ) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কে?

(জ) কোন কবি সংস্কৃত ভাষায় 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন?

(ঝ) চন্দ্রচূড় কে?

(ঞ) পবিত্রিলা আনি মায়ে, এখানে কাকে 'মা', বলা হয়েছে?

৫. সংক্ষিপ্ত উত্তর জন্য প্রশ্ন।

(ক) ভারত রসের স্রোত বলতে কী বুঝায় লেখো?

(খ) সনেট বলতে কী বুঝায়?

(গ) কার শাপে সগররাজের পুত্রগণ কেন ভস্মীভূত হয়েছিলেন?

(ঘ) কে, কীভাবে সগর পুত্রদের মুক্তি দান করেছিলেন?

(ঙ) দ্বৈপায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী ছিল?

(চ) কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অপর কী নামে জানা যায়?

(ছ) মধুসূদন হিন্দুধর্ম ছেড়ে কোন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এবং কেন?

৬. রচনাধর্মী উত্তর লেখো।

(ক) 'কাশীরাম দাস' কবিতার সারমর্ম লেখো।

(খ) কবিতাটির বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে লেখো।

(গ) ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন কাহিনিটি বর্ণনা করো।

৭. ব্যাখ্যা লেখো।

(ক) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।

(খ) ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষ্ণা সে বিমল জলে।

(গ) সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;

(ঘ) ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;

তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।

৮. নিহিতার্থ লেখো।

(ক) সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি

(খ) নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।

(গ) কঠোর গঙ্গায় পূজি-ভগীরথ ব্রতী।

ক্রিয়াকলাপ : ভাষা বিষয়ক

৯. ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো।

চন্দ্রচূড়— চন্দ্র চূড়াতে যাহার (শিব)— (বহুব্রীহি সমাস)
জটাজালে— জটা রূপ জালে— (রূপক কর্মধারয় সমাস)
ত্রিভুবন — তিন ভুবনের সমাহার (দ্বিগু সমাস)
স্ববলে— বলের সহিত (অব্যয়ীভাব সমাস)
দ্বৈপায়ন— দ্বীপে জন্ম যার (ব্যাসদেব)— (বহুব্রীহি সমাস)

১০. বাক্য রচনা করো।

জটাজাল, দ্বৈপায়ন, সংস্কৃত, তৃষ্ণায় আকুল, পুণ্যবান।

১১. পদান্তর করো।

ভারত— ভারতীয়, সংস্কৃত— সংস্কার, রস— রসাল, কঠোর— কঠেরতা, কাঠিন্য। গঙ্গা— গাঙ্গেয়, তৃষ্ণা — তৃষিত, তৃষ্ণার্ত।

১২. তুমি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার দরুন অনুপস্থিতির কারণ দর্শিয়ে প্রধান শিক্ষককে সম্বোধন করে একখানি আবেদন-পত্র রচনা করো।

১৩. অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়।

সনেট শব্দটি ইতালি শব্দ। বাংলায় সনেটকে চতুর্দশপদী কবিতা বলা হয়। ইতালিয়ান কবি পেত্রার্ক প্রথম সনেট রচনা করেন। চৌদ্দটি পঙ্‌ক্তিতে বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্রকায় কবিতা হল সনেট। এক একটি পঙ্‌ক্তি চৌদ্দটি অক্ষরে সীমিত। চৌদ্দটি পঙ্‌ক্তিতে কবির আবেশ অনুভূতি প্রকাশিত হয় বলে একে চতুর্দশপদী কবিতাও বলা হয়।

জেনে নাও।

১. বিশ্বসাহিত্যে কে প্রথম সনেট রচনা করেন?

২. বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সনেটের প্রবর্তক কে?

৩. সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

সাধক

মানকুমারী বসু
(১৮৬৩—১৯৪৩)

আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ
মুকুতা মাণিক্য নিধি
আমারে দিও না বিধি!
চাহিনে এ জগতের রাজত্ব সম্মান;
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে,
প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে'
মেগে নেব মনুষ্যত্ব— শ্রেষ্ঠ উপাদান
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ

আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা,
কয় না সাজানো কথা,
জানে না যোগাতে মন করি' নানা ভান
প্রাণ খোলা মন খোলা,
আপনি আপনা ভোলা

তার-স্নেহ-প্রীতি সবই হৃদয়ের টান।
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ।

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
পায়ে ঠেলে তোষামোদ,
নীচতার অনুরোধ

তার ব্রত— সত্যরক্ষা, সত্যানুসন্ধান,
চাহে না নিজের ইষ্ট,

অতুল কর্তব্য নিষ্ঠ,
ধরা প্রতিকূল হলে নহে কম্পমান
জীবন্ত-সংগ্রামে নিত্য
বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয় নিশান।
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ।

কবি পরিচিতি



আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরীর কন্যা মানকুমারী বসু। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা দেশের যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন মানকুমারী বসু। ছোট বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সাহিত্য রচনা ও সমাজ সেবায় ব্রতী হন। তাঁর রচিত অধিকাংশ কবিতা "বামাবোধিনী" ও "সখা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটগল্পের জন্য পেয়েছেন 'কুন্তলীন' পুরস্কার। পরিণত বয়সে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেছেন। আশি বছর বয়সে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর কবির প্রয়াণ ঘটে।

কবিতাটির মূলভাব

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান মনুষ্যত্ব। মহৎ কর্মের উদ্‌যাপনের মধ্যে জীবনের সার্থকতা নিহিত। কবি মানবতার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্থিব জীবনের ধন-রত্ন, ঐশ্বর্য সম্পদকে অবলীলায় তুচ্ছ করে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন। কবি এমন জীবন কামনা করেন যেখানে ছলনা, কপটতা, চাটুকারিতা নেই, আছে কেবল পবিত্র, নির্মল, সরলতা মাখা স্নেহ, ভালোবাসা পূর্ণ হৃদয়। কবি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বীরত্বে পরিপূর্ণ, সত্যানুসন্ধানি জীবনের প্রত্যাশী। যাঁরা প্রতিকূল পরিবেশে ভীত-সন্ত্রস্ত না-হয়ে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসেব না-করে জীবনপণ করে বীরদর্পে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাঁদের জয়গাথাপূর্ণ বিজয়কেতন তাঁদের জীবনকে মহীয়ান করে তোলে। কবি এমন বীর তেজোদীপ্ত প্রাণকে স্বাগত জানান।

পাঠটি চয়নের উদ্দেশ্য

জীবনকে সার্থক করার জন্য সৎ, বীর, আত্মপ্রত্যয়ী, সত্যানুন্ধানি, কর্মযোগী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী প্রাণের প্রয়োজন। সেদিকে দৃষ্টি রেখে ছাত্রছাত্রীদের চারিত্রিক উন্নতি সাধনের প্রয়াসে নীতিশিক্ষামূলক কবিতা 'সাধক' সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

শব্দার্থ

মহৎ— শ্রেষ্ঠ। সাধক— উপাসক, আরাধক। নিধি— ভাণ্ডার। বাঞ্ছিত— অভিলষিত, ঈপ্সিত। ভান— ছল, কৃত্রিম আচরণ। তোষামোদ— খোশামোদ, মনোরঞ্জন। নীচতা— হীনতা। সত্যানুসন্ধান— প্রকৃত তথ্য জানার জন্য অনুসন্ধান বা গবেষণা। ইষ্ট— মঙ্গল। ধরা— পৃথিবী। সংগ্রাম— যুদ্ধ। নিশান— পতাকা।

প্রশ্নাবলি

১. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

(ক) কবিতাটি অবলম্বনে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(১) চাহিনে এ জগতের—— সম্মান।

(২) আমি চাই—— উলঙ্গ পরাণ।

(৩) পায়ে ঠেলে ——,
——অনুরোধ।

(৪) ——প্রতিকূল হলে নহে ——।

(৫) অনন্তে উড়িছে তার বিজয় ——।

(খ) ভুল শব্দটি বাছাই করে তাতে সঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্যটি লেখো।

(১) আমি চাই বৃহতের মহৎ পরাণ।

(২) জানে না যোগাতে মন করি নানা মান।

(৩) তার-স্নেহ-প্রীতি সবই বাহিরের টান।

(৪) ধরা অনুকূল হলে নহে কম্পমান।

(৫) আকাশে উড়িছে তার বিজয় নিশান।

২. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।

ক) 'সাধক' কবিতাটি কার লেখা?

(খ) সাধক কবিতায় কবি নিজেকে কীসের সাধক বলেছেন?

(গ) কবির মতে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান কী?

(ঘ) কাদের মুখে সরলতা মাখা থাকে?

(ঙ) তেজস্বী প্রাণ কার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে?

৩. ৩/৪টি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) মুকুতা মাণিক্য নিধি
আমারে দিও না বিধি! —— কবির এমন আবেদনের কারণ কী?

(খ) আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ।—— শিশুদের সম্বন্ধে কবির মনোভাব উল্লেখ করো।

(গ) কবি কোন প্রাণের সাধনা করেন?

৪. রচনাধর্ম-ধর্মী উত্তর লেখো।

(ক) 'সাধক' কবিতাটির মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখো।

(খ) 'সাধক' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

(গ) মানকুমারী বসুর অনুভূতিতে মহৎ প্রাণের কী-রূপ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে লেখো।

(ঘ) 'অনন্তে উড়িছে তার বিজয় নিশান।' —— কার বিজয় নিশানের কথা বলা হয়েছে? কবিতাটি অবলম্বনে উক্তির যথার্থতা আলোচনা করো।

৫. ভাষা-ব্যাকরণ।

(ক) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো।**

সম্মান; মাণিক্য; বাঞ্ছিত; সত্যানুসন্ধান; ইষ্ট; সংগ্রাম।

(খ) **প্রত্যয় নির্ণয় করো**

সাধনীয়; কর্তব্য; সাধক; কম্পমান; তেজস্বী।

বিভিন্ন পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ ও বাগ্‌ধারা

বাগভঙ্গি বা বাগ্‌বিধি (Idioms) প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বিভিন্ন পদকে অন্যপদের সংযোগে নানাপ্রকার অর্থে ব্যবহার করাই এর বৈশিষ্ট্য। মনে রাখতে হবে, বাগ্‌ভঙ্গি বা বাগ্‌বিধি বা বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচন এক নয়।

যে পদ বা বাক্যাংশের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায় তাকেই বিশিষ্টার্থ বাক্যাংশ বলা যায়।

১. বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কান :

কান পাতা (মনঃসংযোগ করা) — কান পেতে শোনো, একজন কেউ ডাকছে।

কান কাটা (নির্লজ্জ) — লোকটির দু কান কাটা, গালাগাল গায়ে মাখে না।

কান ভাঙানি (বিরুদ্ধভাবাপন্ন করা) — আর কত কান ভাঙানি দেবে শ্বশুরের?

বুক :

বুক ফাটা (অত্যন্ত করুণ) — একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বিধবা মায়ের বুক ফাটা হাহাকার, সত্যিই বেদনাদায়ক।

বুক উঁচু (গর্বিত হওয়া) —দরিদ্র পিতা কৃতী সন্তানের সাফল্যের সংবাদ বুক উঁচু করে সকলকে বলে বেড়াচ্ছেন।

বুক ভরা (পরম তৃপ্তি) — সন্তানের সাফল্যে বাবা-মায়ের বুক ভরে ওঠে।

চোখ :

চোখ ওঠা (চোখের অসুখ) — চোখ উঠলে বাইরে রোদে বেড়ানো যায় না।

চোখ বোজা (মৃত্যু হওয়া) — আমি চোখ বুঝলে টের পাবে বাছা, কত ধানে কত চাল।

চোখের নেশা (যুক্তিহীন আসক্তি) — কিছু ভেবো না, চোখের নেশা কাটলে ছেলে আপনিই ঘরে ফিরে আসবে।

২. বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

পাকা :

পাকা (পরিণত) — পাকা ফল সর্বদাই সুস্বাদু।

পাকা মাথা (পরিণত বুদ্ধি) — নিজেরা বাহাদুরি না করে কোনো একজন পাকা মাথার পরামর্শ নাও গে যাও।

পাকা কথা (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত) — মাফ করবেন, এই মুহূর্তেই আমি আপনাকে কোনো পাকা কথা দিতে পারছি না।

কাঁচা :

কাঁচা বয়স (প্রথম যৌবন) — কাঁচা বয়সে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

কাঁচা কাজ (ত্রুটিপূর্ণ কাজ) — সমীরবাবু, আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়েও এমন কাঁচা কাজ করে বসবেন এ আমি ভাবতেও পারিনি।

মোটা :

মোটা গলা (কর্কশ কণ্ঠ) — দয়া করে চুপ করো, তোমার ঐ মোটা গলায় রবীন্দ্রসংগীত মানায় না।

মোটা বেতন (বেশি বেতনের চাকরি) — দিলীপ তার বাপের পরিচয়েই বিলিতি ফার্মে এমন মোটা বেতনের চাকরিটা বাগাতে পেরেছে।

মোটা মাথা (স্থূল বুদ্ধি) — ওকে বলে কী হবে, ওর মোটা মাথায় এসব কথা ঢুকবে না।

মোটা ভাত, মোটা কাপড় (কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা) — দেখুন আমাদের আর সে অবস্থা নেই, তবে এটুকু বলতে পারি আমাদের পরিবারে আপনার মেয়ের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব হবে না।

৩. **ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ**

লাগা :

রং লাগা (আনন্দের আভাস) — "মনের বনে রং লেগেছে অনুরাগে।"

ঘোর লাগা (বিহ্বল ভাব) — দুর্গা প্রতিমার কারুকার্য দেখে আমার ঘোর লেগে গেছে।

চোখ লাগা (নজর পড়া) — লোকের চোখ লেগে আমার অমন ফলন্ত গাছটা মরে গেল।

কাটা :

আঁচড় কাটা (গভীরভাবে অনুভব করা) — তুমি যেমন, অত সূক্ষ্ম কথা কী ওর মনে আঁচড় কাটবে মনে করেছ?

ছড়া কাটা (কথায় কথায় কবিতা বলা) — ঝগড়াটে গ্রাম্য মেয়েরা ছড়া কেটে গাল দেয়।

ঘোর কাটা (আচ্ছন্নভাব কেটে যাওয়া) — যখন ঘোর কাটল, দেখলাম আমি একা।

গলা কাটা (বেশি দাম চাওয়া) — বলেন কী মশাই, এতটুকু একটা গামছার দাম ৪০ টাকা! আপনি তো গলাকাটা দাম চাইছেন।

ওঠা :

কথা ওঠা (আপত্তি হওয়া) — এত বারণ করলাম তবুও কাজটা করলে, জানি এটা নিয়ে কথা উঠবে।

চোখ ওঠা (অসুখ) — নমিতার চোখ উঠেছে।

মন ওঠা (সন্তুষ্ট হওয়া) — এ শাড়িতে গিন্নির মন উঠবে না।

খাই খাই

সুকুমার রায়
১৮৮৭—১৯২৩

খাই খাই কর কেন, এসো বসো আহারে,
খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড়ো করে আনি সব, থাকো সেই আশাতে
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য।
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি।
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে,
খুঁজে পেতে আনি খেতে— নয় বড়ো সিধে সে!
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিয়ো।
ফল বিনা চিঁড়ে দই, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।
ব্যাং খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপ রে কী গন্ধ!
মাদ্রাজি ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট।
আরশোলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কী যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।
দেখে শুনে চেয়ে খাও, যেটা চায় রসনা;
তা না হলে কলা খাও— চটো কেন? বসো না!
সবে হল খাওয়া শুরু, শোনো শোনো আরও খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়িগাড়িতে,
খাসা দেখো 'খাপ খায়' চাপকানে দাড়িতে।

তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?
ডিঙি চড়ে স্রোতে পড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা।
বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত— তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারিটা তাড়া খায়, ভিখ নাহি পায় রে,
'দিন আনে দিন খায়' কত লোকে হায় রে।
হোঁচটের চোট খেয়ে খোকা ধরে কান্না,
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য,
কিল চড় লাথি ঘুসি হয় তার খাদ্য।
জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায় রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায় রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিমসিম,
পিছলে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিমঝিম।
কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাবড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাত হয়ে গোঁত খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখো ডিগবাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা!
কথা শোনো, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেয়ো না,
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেয়ো না।
'ফেল' করে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদা-নুন খেয়ে লাগো, পাশ করো এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা 'খেয়ো নাকো, যেয়ো নাকো ভড়কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা।

আরাকান হানাথবথী। ১৮ শতকে ব্রিটিশরা বার্মা দখল করে। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৬২ সাল থেকে বার্মায় সামরিক সরকার শাসন ক্ষমতায় আসে।

চীন

চীন দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৩০ কোটির অধিক জনসংখ্যা ও বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠীর দেশ চীন এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র। এবং পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। চীনারা তাদের দেশকে চুংকুও বলে ডাকে। যার অর্থ মধ্যদেশ। চীন নামটি বিদেশীদের দেওয়া। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের 'ছিন' রাজবংশের নামের বিকৃত রূপ (উচ্চারণ) চীন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পাঁচভাগের এক অংশ চীন দেশে বসবাস করে।

কাশী

বর্তমান উত্তর প্রদেশে অবস্থিত ভারতবর্ষের প্রাচীন শহর। গঙ্গার তীরে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরটি ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলোর অন্যতম। আদি শঙ্করাচার্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ এই মন্দির দর্শন করেছিলেন।

১. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

ক. রুটি লুচি ইত্যাদি খাবার যে প্রস্তুত করে তাকে কী বলে?

খ. টক, ঝাল খাবার তৈরি করে কে?

গ. তরল খাবার কোনগুলো?

ঘ. ফলাহার কী?

ঙ. জলযোগ বলতে কী বোঝো?

চ. ফরাসিরা খায় এমন একটি খাবারের নাম লেখো।

ছ. বার্মার খাবার কী?

জ. ফড়িঙের ঘন্ট খায় কারা?

ঝ. চীনাদের প্রিয় খাদ্য কী?

ঞ. ভারতের প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের নাম বল।

ট. কবিতায় ব্যবহৃত একটি প্রবাদের উল্লেখ করো। উত্তর--- নুন খাই গুণ গাই।

ঠ. নুন খাই গুণ গাই। ---- এরকম আরো দুটি প্রবাদ লেখো।

ড. বোকারা কী খায়?

ঢ. পালোয়ান কতটা ডিগবাজি খায়?

২. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

১. সুদ খায় ——— ঘুষ খায় ———।

২. বাবু যান ———।

৩. এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে ———।

৪. কাশীতে প্রসাদ খেয়ে ——— হই পাক্কা।

৩. ক অংশের সঙ্গে খ অংশ মেলাও।

ক	খ
১. খোকারা	ক. ডাল ভাত খায়
২. ঘুড়িটা	খ. ব্যাং খায়
৩. বেহালা	গ. ঘুষ খায়
৪. পালোয়ান	ঘ. দোল খায়
৫. দারোগা	ঙ. গোঁত খায়
৬. ফরাসিরা	চ. মোচড় খায়
৭. বাঙালি	ছ. আরসোলা খায়
৮. চীনারা	জ. ডিগবাজি খায়
৯. লোকে	ঝ. কত কী খায়।

৪. 'খাই খাই' পদ্যটিতে যত খাবারের কথা কবি বলেছেন তার তালিকা তৈরি করো।

৫. বাক্য রচনা করো।
মিশ খায়, দিন আনে দিন খায়, হাওয়া খায়, নুন খাই, বিষম খাওয়া, মাথা খাও।

৬. 'খাই খাই' পদ্য অবলম্বনে 'খাওয়া' ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখাও। যেমন—
পাঠশালার ছেলেরা বেত খেয়ে খাবি খায়।

৭. 'খাই খাই' পদ্যে ব্যবহৃত বিশিষ্টার্থক (বিশেষ অর্থবোধক) বাক্যাংশগুলি বাছাই করে বাক্য রচনা করো।
যেমন— পাক খাওয়া (দিশেহারা) — পরীক্ষার সময় কী পড়ব দিশে পাচ্ছি না, শুধু বই-খাতার মধ্যে পাক খাচ্ছি।

ধাতু

কোনো ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে অর্থাৎ পদটির প্রত্যয়-বিভক্তি বিচ্ছিন্ন করলে যে মূল কাঠামোটি পাওয়া যায় তাকে বলে 'ক্রিয়া-ধাতু' বা 'ধাতুমূল' (Verb root) বা সংক্ষেপে ধাতু (Root)।

যাবতীয় সংস্কৃত ক্রিয়াপদের মূলে রয়েছে কতকগুলি একাক্ষর ধাতু। পাণিনি প্রায় দু'হাজার ধাতুর উল্লেখ করেছেন। বাংলায় ব্যবহৃত মোট ধাতুর সংখ্যা প্রায় ১৫০০ হলেও এদের অনেকগুলিই ব্যবহার হয় না বলে অপ্রচলিত। বাংলা ধাতুর কিছু এসেছে সংস্কৃত থেকে, অবশিষ্ট প্রাকৃত, দেশী শব্দ, নাম শব্দ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে এসেছে। কিছু এসেছে বিদেশী শব্দ থেকে।

ধাতুর শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তি ও প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করে ধাতুকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু; (২) সাধিত ধাতু ; (৩) সংযোগমূলক ধাতু; (৪) যৌগিক বা মিশ্র ধাতু।

(১) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু — যে-সব ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, যাদের আর বিশ্লেষণ করা যায় না তাদের সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু বলে। যেমন—

খা, কর, যা, দেখ্, বল্, শুন্, ধর্, পড়্, হাস্, কাঁদ্, সর্, সহ্, দুল্, মর্ ইত্যাদি।

ধাতুগুলির সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদে পরিণত করলে (সাধুভাষায়) হয়—

খা (ধাতু) + ইব (বিভক্তি) = খাইব (ক্রিয়াপদ)

কর্ (ধাতু) + ইলাম (বিভক্তি) = করিলাম (ক্রিয়াপদ)

যা (ধাতু) + ইব (বিভক্তি) = যাইব (ক্রিয়াপদ)

সিদ্ধ ধাতুর শ্রেণিবিভাগ : সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুকে উৎসের বিচারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন— ক। সংস্কৃত ধাতু খ। তদ্ভব ধাতু গ। অজ্ঞাত মূল খাঁটি বাংলা ধাতু ঘ। সংস্কৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ থেকে উৎপন্ন ধাতু ঙ। কবিতায় ব্যবহৃত ধাতু চ। ধ্বন্যাত্মক ধাতু ইত্যাদি

ক। সংস্কৃত ধাতু— চর্, চল্, ভজ্, পাল্, জ্বল, লিখ্, দুহ্, ঘট্, বাধ্, দুল্, শুষ্, পিস্, জ্বল্, ফল্, যা, সাধ্ ইত্যাদি।

খ। তদ্ভব ধাতু— কৃ > কর্, ধৃ > ধর্, দা > দি, মৃ > মর্, পঠ্ > পড়, জ্ঞা > জ্ঞান্, পত্ > পড়।

গ। **অজ্ঞাতমূল** খাঁটি বাংলা ধাতু— টুট্, জুড়্, ঘির্, ভাস্, ডাক্, নড়্, হাঁট্, বাঁচ্, খাট্, ফেল্, এড়্, রখ্, ঠেল্, বল্, খুঁজ্, কাঠ্ ইত্যাদি।

ঘ। সংস্কৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ থেকে উৎপন্ন ধাতু — মত্ত > মাতন, গর্ত > গাড়, ভ্রষ্ট > ভড়কা, পাক > পাক্ ইত্যাদি।

ঙ। **কবিতায় ব্যবহৃত** ধাতু — পাসর্, বধ্, নম্, বন্দ্, হের্, নেহার্, কুহর্, স্মর, ত্যজ্, দহ্, প্রা + বিশ্ > পশ্, বি-রাজ > বিরাজ ইত্যাদি।

চ। ধ্বন্যাত্মক ধাতু

ধুকন, ফুঁস্, ফুঁক্, ঠুক্, হাঁচ্ ইত্যাদি।

২। সাধিত ধাতু — যে সব ধাতুকে বিশ্লেষণ করলে মৌলিক ধাতু প্রত্যয়, বিশেষ্য-বিশেষণ প্রত্যয় এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ পাওয়া যায় তাকে সাধিত ধাতু বলে।

যেমন— কর্ + আ = করা, হাস্ + আ = হাসা, দেখ্ + আ = দেখা, শোন্ + আ = শোনা,
কাঁদ্ + আনো = কাঁদানো, বেড়্ + আনো = বেড়ানো, খেল্ + আনো = খেলানো ইত্যাদি।

কর্মবাচ্যের ধাতু : মূল ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হলে কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত হয়। যেমন—

দেখ্ + আ = দেখা, শুন্ + আ = শুনা, কর্ + আ = করা, বল্ + আ = বলা,
লেখ্ + আ = লেখা, হাঁট্ + আ = হাঁটা, নাচ্ + আ = নাচা, খেল্ + আ = খেলা,
চল্ + আ = চলা, কাঁদ্ + আ = কাঁদা, ছোট্ + আ = ছোটা, মান্ + আ = মানা ইত্যাদি।

৩। সংযোগমূলক ধাতু

যে সব ধাতু বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়ে নানা প্রকার বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদে পরিণত হয় তাকে সংযোগমূলক ধাতু বলে।

যেমন— কর্, হ, পা, দে, বা, বাস্, মার্, খা ইত্যাদি।

সংযোগমূলক ধাতুর ক্রিয়ারূপ : ডুব দেওয়া, মাথা খাওয়া, দৌড় দেওয়া, ভূতে পাওয়া, লজ্জা পাওয়া, কষ্ট পাওয়া।

৪। যৌগিক বা মিশ্র ধাতু

অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে পড়, ফেল, দে, লাগ্, থাক্, উঠ্, ইত্যাদি ধাতু যুক্ত হলে তাকে যৌগিক বা মিশ্র ধাতু বলে। যেমন— খেয়ে + ফেল্ = খেয়ে ফেল, বলে + ফেল্ = বলে ফেল, বসে + পড় = বসে পড়।

ধুলামন্দির

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৬১—১৯৪১

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে— দেবতা নাই ঘরে।।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার 'পরে।।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।।

কবি পরিচিতি



কলকাতার জোড়সাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতার নাম সারদা দেবী। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষীরূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের এমন কোনও দিক নেই যেখানে প্রতিফলিত হয়নি। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, গান, চিত্রকলা প্রতিটি শাখাতেই কবির হাতের ছোঁয়া লেগেছে; এবং বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্র প্রতিভা এক অপার বিস্ময়। কবিগুরু ১৯১৩ সালে ভারতবাসী হিসেবে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কারে বিভূষিত হন। কবির কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'সোনারতরী', 'খেয়া', 'মানসী',

'নৈবেদ্য', 'মহুয়া', 'পূরবী', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য'প্রভৃতি অন্যতম। ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট বিশ্ব কবির দেহাবসান ঘটে।
আলোচ্য কবিতাটি কবির 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

কবির 'ধুলামন্দির' কবিতাটিতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নবীন কিশোরদের ভাবজীবনের সূচনালগ্নে নির্মল কলুষ-মুক্ত চিন্তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া জরুরি। তাই পাঠ্য সংকলনে পাঠটি সংকলিত হয়েছে।

শব্দার্থ

ভজন— ভজনা করা। দেবালয়— মন্দির, দেবতার আলয় বা গৃহ, দেবগৃহ। সংগোপনে— অন্তরালে, আড়ালে। শুচি— শুদ্ধ, কলুষমুক্ত, ময়লাহীন। মুক্তি— উদ্ধার। বসন— কাপড়, পোশাক, বস্ত্র। নয়ন— চোখ, চক্ষু, আঁখি। দেবতা— ঈশ্বর, ঠাকুর। আরাধনা— উপাসনা। রুদ্ধদ্বারে— দ্বার বন্ধ করে, দরোজা বন্ধ করে। প্রভু— ঈশ্বর, ভগবান।

১. পাঠের জ্ঞাতব্য বিষয়

ভজন, পূজন এবং সাধনার মূল উদ্দেশ্য হল ভগবানের সান্নিধ্য লাভ। অধ্যাত্ম পিপাসু মানুষের মনে এটাই বদ্ধমূল ধারণা যে দেবতা বা ঈশ্বর দেবালয় বা মন্দিরে বাস করেন। কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান। সব কিছুতেই বর্তমান। তিনি প্রকৃত অর্থে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে, মন্দিরের চার দেয়ালের মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকেন না। তাঁর ব্যাপ্তি অনল-অনিলে, চির-নভোনীলে, জলদের গায়ে, ও শশী-তারকায়। তিনি আপামর খেটে খাওয়া মানুষের কর্মের মধ্যেও আছেন। দুহাতে তাঁর কর্মের চিহ্ন বর্তমান। তাই পূজারিদের রুদ্ধদ্বার দেবালয়ে ফুলমালা চন্দন দিয়ে ভগবানের পূজা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কবির মতে দেবালয়ের অন্ধকার কোঠায় দেবতার সন্ধান করা নিষ্ফল।

মানস চক্ষু দিয়ে দেখলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেলে। ঈশ্বর খেটে খাওয়া মানুষ ও তাদের কাজের মধ্যে লীন হয়ে আছেন। রৌদ্রে-জলে ধুলিকণায় ইট-কাঠ পাথরে গড়া বাস্তব পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের বাস। তাই কবি ভক্তদের দেবালয়ে পরিহিত শুচি বসন ছেড়ে ধুলার পরে নেমে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। কবি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করে বলেছেন যে মুক্তি কোথাও নেই। কারণ ঈশ্বর নিজেই তাঁর সৃষ্টির নিকট বাঁধা আছেন। কর্মই ধর্ম। ধুলিমাখা হাতে কর্মযোগে ঘর্ম ঝরানোর মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব।

২. ক্রিয়াকলাপ

শুদ্ধ উত্তরটি বেছে বের করো।

(ক) **প্রকৃত পক্ষে দেবতার আবাস কোথায়?**
(১) দেবালয় (২) মন্দির (৩) সর্বত্র (৪) কর্মের মধ্যে

(খ) **ঈশ্বর কার কাছে বাঁধা থাকেন?**
(১) জীবের কাছে (২) সৃষ্টির কাছে (৩) পূজারির কাছে (৪) পূজার কাছে

(গ) **কবির মতে প্রকৃত ধর্ম কী?**
(১) সাধনা (২) পূজার্চনা (৩) কর্ম (৪) মন্ত্রপাঠ

(ঘ) **ঈশ্বরের দু'হাতে কী লেগে থাকে বলে কবি বলেছেন?**
(১) ধুলা (২) চন্দন (৩) ফুল (৪) মাটি

(ঙ) **কবি পূজারিকে কী ছেড়ে ধুলার পরে আসতে বলেছেন?**
(১) ফুলের ডালি (২) বস্ত্র (৩) ধ্যান (৪) শুচিবসন।

৩. **বাক্য রচনা করো।** আরাধনা, সৃষ্টিবাঁধন, ফুলের ডালি, ধুলাবালি। যেমন—

রুদ্ধদ্বার : পূজারি রুদ্ধদ্বার মন্দিরে পূজা-আরাধনায় মগ্ন।

কর্মযোগ : গীতায় বলা হয়েছে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ।

সংগোপনে : ভক্তের ঈশ্বর আরাধনা সংগোপনে সমাধা হয়।

৪. **শূন্যস্থান পূর্ণ করো।**

(ক) ——দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।

(খ) কাহারে তুই পূজিস ———।

(গ) ——তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

(ঘ) আপনি প্রভু ------প'রে বাঁধা সবার কাছে।

(ঙ) ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ——।

৫. **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।**

(ক) 'ধুলামন্দির' কবিতার কবি কে?

(খ) কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(গ) প্রকৃতপক্ষে দেবতার বা ঈশ্বরের বাস কোথায়?

(ঘ) ভক্তরা ভজনা বা পূজার্চনা করেন কেন?

(ঙ) প্রকৃত ধর্ম কী?

(চ) কবির মতে দেবতা আসলে কোথায় থাকেন?

(ছ) ঈশ্বর বা প্রভু কাহার নিকট বাঁধা থাকেন?

৬. **সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।**

(ক) কবিতায় কবি ভগবান বা দেবতাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে বলে প্রকাশ করেছেন?

(খ) কবির মতে মুক্তির উপায় কী বর্ণনা করো?

(গ) কর্মযোগ বলতে কী বুঝায়? কর্মের প্রকৃত অর্থ কী?

(ঘ) রুদ্ধ দেবালয়ে দেবতা থাকেন কী? কেন?

(ঙ) কবির মতে দেবতা প্রাপ্তির প্রকৃত উপায় কী?

৭. **রচনাধর্মী উত্তর লেখো।**

(ক) 'ধুলামন্দির' কবিতার সারাংশ লেখো।

(খ) কর্মের মধ্যে দিয়ে দেবতার সান্নিধ্য পাওয়া যায়— কথাটির মূল বক্তব্য আলোচনা করো।

(গ) 'ধুলামন্দির' কবিতার মূল ভাব ব্যক্ত করো।

(ঘ) 'ধুলামন্দির' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৮. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো।

(ক) রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—

(খ) 'নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে— দেবতা নাই ঘরে।'

(গ) 'আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।'

(ঘ) 'রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি।'

৯. তাৎপর্য লেখো।

(ক) ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে

(খ) মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে ?

(গ) পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।

১০. টীকা লেখো। মন্দির, মুক্তি, কর্মযোগ।

১১. ভাষা - ব্যাকরণ।

বাক্যের অর্থমূলক শ্রেণিভেদ

অর্থবোধই বাক্যের মূল বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন ধরনের বাক্য শ্রোতার কাছে বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে। তাই অর্থানুসারে বাক্যকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। অর্থানুসারে বাক্যকে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে : (১) নির্দেশক বাক্য (ক) অস্ত্যর্থক বাক্য (খ) নাস্ত্যর্থক বা নঞর্থক বাক্য (২) প্রশ্নবোধক বাক্য (৩) অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (৪) ইচ্ছাসূচক বা প্রার্থনাসূচক বাক্য (৫) কার্যকারণাত্মক বাক্য (৬) সন্দেহদ্যোতক বাক্য (৭) বিস্ময়াদিবোধক বাক্য।

নির্দেশক বাক্যকে আবার অস্ত্যর্থক বা সদর্থক (হাঁ-বাচক) এবং নাস্ত্যর্থক বা নঞর্থক (না-বাচক) —এই দু'টি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) অস্ত্যর্থক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব, অবস্থাদি বিবৃতির দ্বারা স্থাপন করা হয় তাকে অস্ত্যর্থক বা সদর্থক বাক্য বলে। যেমন :

সৎ ব্যক্তিকে সকলে বিশ্বাস করে। সামান্য কারণেই গ্রামে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। আজ সন্ধ্যেয় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছবেন। রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়বৃষ্টির বেগ থেমে গেল

(খ) নাস্ত্যর্থক বা নঞর্থক বাক্য : যে বাক্যে বক্তা বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃতি, নিষেধ না-র মনোভাব প্রকাশ করে তাকে নাস্ত্যর্থক বাক্য বলে। যেমন :

আমি অন্যায় যুদ্ধ করিনি। বিধিলিপি কেউ খণ্ডাতে পারে না। শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নেই। ভিক্ষার দিনে ভিক্ষায় বাহির হয়নি। রাজপথে লোক দেখি না। চৌকি শুনে কুকুর ডাকে না।

২। **প্রশ্নবোধক বাক্য** : যে-বাক্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় অর্থাৎ কোনো কিছু জানার ইচ্ছা প্রকাশ পায় তাকে প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন : দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দেবে না ? আমাকে চিনতে পারছ না ? মহাশয়ের নিবাস কোথায় জানতে পারি ? তোর নাম কী রে ? ব্ল্যাকমার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী ? 'হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে কে তুমি ?'

(খ) **বাক্য পরিবর্তন করো।**

(১) তাহাকে সকলেই চিনে। (অস্ত্যর্থক)
—তাহাকে কে না চিনে ? (প্রশ্নাত্মক)

(২) রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। (অস্ত্যর্থক)
—রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কি ? (প্রশ্নাত্মক)

(৩) সকলে ভুল করে। (অস্ত্যর্থক)
—ভুল কার না হয় ? (প্রশ্নাত্মক)

(৪) তোমার নাম সকলেই জানে। (অস্ত্যর্থক)
—তোমার নাম কে না জানে। (নঞর্থক)

কবর

জসীমউদ্‌দীন

১৯০৪—১৯৭৬

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা.
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালি ঊষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।

বাপের বাড়িতে যাই বার কালে কহিত ধরিয়া পা
“আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু, উজান-তলির গাঁ।”
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি ছপয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ির বাটে!
হেস না—হেস না—শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদী যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, “এতদিন পরে এলে.
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।”
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়।

হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্— দাদু, "আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।"

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়— আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই? কি করিব দাদু! পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
"বা-জান, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।"
ঘরের মেঝেতে সপ্টি বিছায়ে কহিলাম, "বাছা শোও",
সেই শোওয়া তার শেষ হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা "বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?"
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
(সংক্ষেপিত)

কবি পরিচিতি



কবি জসীমউদ্দীন বাংলা সাহিত্য জগতে 'পল্লি কবি' হিসেবে সুপরিচিত। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অম্বিকাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন। তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা।

বাংলার গ্রামজীবন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর কবিতায় সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। অনাড়ম্বর উপস্থাপনা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছাত্রাবস্থায় 'কবর' রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

কবির রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'রাখালী', 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'রূপবতী', 'পদ্মাপার', 'মাটির কান্না' ইত্যাদি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৩ মার্চ কবির দেহাবসান ঘটে।

কবিতাটির মূলভাব

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পটভূমিতে সাংসারিক স্নেহ-প্রেমের আশ্চর্য করুণাঘন রূপ ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে। জীবন সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে অতীত জীবনের সুখের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করছে দাদু, তার একমাত্র নাতির কাছে। ত্রিশ বছরের বিপত্নীক জীবন দাদুর কাছে বড় দুঃসহ হয়ে ওঠে। দাদুর স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। ছোট্ট সুন্দরী বধূর রূপ লাবণ্যে সারা বাড়ি সোনালি রঙে উজ্জ্বল হত। দাদু লাঙল নিয়ে মাঠে যাবার সময় আড়চোখে বারবার স্ত্রীকে দেখে নিতেন। দাদির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমঘন সান্নিধ্য দাদুর মনকে অভিষিক্ত করে দিয়েছিল। দাদি বাপের বাড়ি যাবার সময় দাদুকে বারবার অনুরোধ করতেন যেন মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখে আসেন। বৃদ্ধ দাদু শাপলার হাট থেকে তরমুজ বিক্রি করে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে স্ত্রীর জন্য তামাক, মাজন ও পুঁতির মালা নিয়ে সন্ধ্যাবেলা শ্বশুর বাড়িতে যেতেন। এই সমস্ত উপহার পেয়ে দাদি ভীষণ খুশি হত এবং দাদুর আসার আশায় কত যে অপেক্ষা করত সে কথাও হাসি মুখে জানিয়ে দিত। কবিতাটি সরল সুন্দর গ্রামবাংলার ঘরোয়া জীবনচিত্র।

পাঠের উদ্দেশ্য

মৃত্যুর পটভূমিতে সাংসারিক স্নেহ-প্রেমের আশ্চর্য করুণাঘন রূপ কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। উপহার সামগ্রী নয়, ভালবাসার গভীরতা দিয়ে ভালবাসাকে বিচার করতে হয়। বিশ্বজনীন আবেদনের প্রেক্ষিতে রচিত জীবনবোধের এক অপূর্ব ফসল 'কবর' কবিতা। অনাড়ম্বর জীবনের মধুরতা কত মাহাত্ম্যবোধক তা এই কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এটি শিক্ষণীয় বিষয়।

শব্দার্থ

কবর— সমাধি।
ঊষা— সূর্য, ভোরবেলা।
লাঙল— জমি চায করার যন্ত্র, হল্।
বাটে— পথে।
নয়ন— চোখ।
তামাশা— কৌতুক, মর্জা।
গাঁটে— ট্যাঁকে, বাঁধনে।
নথ— নাকের একপাশে পরার গয়না।

টীকা

কবর

ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির মৃত্যুর পর মাটি খুঁড়ে মৃতদেহকে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির এই অন্তিম শয্যার নাম কবর।

প্রশ্নাবলি

১. শুদ্ধ উত্তরটি লেখো

(ক) **দাদীর কবর কোন গাছের নীচে?**
(১) আমগাছ (২) জামগাছ (৩) ডালিম গাছ (৪) কমলা গাছ

(খ) **দাদুর বিপত্নীক জীবন কত বছরের?**
(১) ২০ বছর (২) ৩০ বছর (৩) ৪০ বছর (৪) ৫০ বছর।

(গ) **শাপলার হাটে দাদু কী বিক্রি করতেন?**
(১) তরমুজ (২) নারকেল (৩) কলা (৪) আম



কবি পরিচয়

শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর জন্ম ২০ এপ্রিল ১৯৩৭। জন্মস্থান শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমার সোনাইতা গ্রাম। পিতা শশীভূষণ ব্রহ্মচারী, মাতা প্রভাবতী দেবী। হবিগঞ্জ শহরের জে. কে. স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৬১ সালে বি.এ এবং ১৯৬৮ সালে বাংলায় এম.এ পাশ করেন।

১৯৭১ সালে হাইলাকান্দির এস. এস. কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে শিলচরের গুরুচরণ কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সময় শরীর হৃদয়' (১৯৭১), 'এই পথে অন্তরা' (১৯৭৬), 'অনন্ত ভাসানে' (১৯৮৪), 'কাঠের নৌকা' (১৯৯৪) ইত্যাদি। ২০০৪ সালে অসম সরকারের সাহিত্য পেনশন লাভ করেন। ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কবি পরলোক গমন করেন।

পাঠ্য কবিতাটি 'অনন্ত ভাসানে' কাব্যের অন্তর্গত।

পাঠ প্রসঙ্গ

লোকপুরাণের প্রয়োগে কবিতাটি অসামান্য সাহিত্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। বাংলার মানুষের জীবনে মনসাগাথার যে-প্রভাব তাকে কবি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। একদিকে লোকায়ত জনজীবন অন্যদিকে নাগরিক মানসের জটিলতা এই দুইয়ের মিশেলে কবিতাটি অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করেছে।

কবিতাটিতে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির খবর যেমন আছে, তেমনি আছে বর্তমানের সঙ্গে তার সংশ্লেষিত রূপ; যা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বাঙালি জীবনের শেকড়ের সন্ধান পাবে।

শব্দার্থ

সপ্তডিঙা— সাতটি ডিঙা বিশিষ্ট।
অবিশ্রাম— বিরতিহীন।
ডোবা— বদ্ধ জলাশয়।
ফণা— সাপের ফণা, ছোবল।
কালসন্ধ্যা— সর্বনাশী সময়, বিপদসঙ্কুল সাঁঝবেলা।
ঝিয়ারি— কন্যা, দুহিতা।
নিছনি— প্রাচীন বঙ্গের নগর।
শিকা— বাংলার লোকায়ত আসবাব, পাট নির্মিত পাত্রদান।
কুপিলম্প— বাতি, দীপ।
নিরক্ষরা— বর্ণ পরিচয়হীন।
দখিনা— দক্ষিণ দিকের।
ডহর— নৌকোর খোল। খাল, জলাশয়।
মধুকর— চাঁদ সদাগরের নৌকোর নাম বিশেষ।
এঁদো— পানাপড়া, পঙ্কিল, আলো ঢোকে না এমন
বিষধর— সর্প, সাপ, যে-বিষ ধারণ করে।
কাঁথা— শীতবস্ত্র বিশেষ।
সায়ের— বেহুলার পিতা সায়বেনের।
ভাসান— বিসর্জন।
সাতনরী— হার বিশেষ।
রাতকানা— যে রাতে দেখতে পায় না।
লখা— চাঁদ সাগরের পুত্র।
দিগম্বরা— আদুল গা, উলঙ্গ।
গহন— নিবিড়, গভীর।

প্রশ্নাবলি

১. শূন্যস্থান পূরণ করো—

ক. সপ্তডিঙা —— চারিদিকে জল।

খ. শ্রাবণের অবিশ্রাম ——।

গ. এখনো বুকের — কহে

ঘ. কুপিলম্পে রাতকানা নিরক্ষরা ——

২. 'মনসামঙ্গল' কবিতার বিশেষ্য পদগুলো বাছাই করে সাজিয়ে লেখো। যেমন— মধুকর।

৩. 'মনসামঙ্গল' কবিতার বিশেষণ পদগুলো বাছাই করে লেখো। যেমন— নিরক্ষরা।

৪. পদ পরিবর্তন করো। যেমন—

শ্রাবণ— শ্রাবণী। অবিশ্রাম— অবিশ্রান্ত।

জল, বিল, যন্ত্রণা, গান, ঘর, জাল, রাত, গাঙ, দখিনা।

৫. আঠ-দশটি বাক্যে উত্তর দাও।

ক. 'মনসামঙ্গল' কবিতা অবলম্বনে শ্রাবণের রূপসৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

খ. 'বেহুলা-যন্ত্রণার' পরিচয় দাও।

গ. 'সায়ের ঝিয়ারি' কে? তাঁর অনন্ত ভাসানে যাত্রার বর্ণনা দাও।

৬. রচনাধর্মী উত্তর লেখো।

ক. 'মনসামঙ্গল' কবিতাটির ভাবার্থ লেখো।

খ. 'সায়ের ঝিয়ারি' কথার অর্থ কী? তিনি কেন ভাসানে গেলেন? তাঁর এই ভাসান-যাত্রার করুণ বিবরণ বিশদ করো।

৯. তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

ক. সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।

খ. ছেঁড়া কাঁথা-কানি আর বেহুলা-যন্ত্রণা।

গ. গাঙের গর্ভিণী সেই গন্ধ ভেসে আসে।

ঘ. শ্রাবণীর দিগম্বরা দখিনা বাতাসে।

নির্দেশক প্রত্যয়

(ক) বিশেষ্যের পরে কেবল এক-বচনে নির্দেশক প্রযুক্ত হয়; এবং তখন বিশেষ করে উক্ত বিশেষ্যের গুণ বা রূপ ব্যতীত তার অবস্থানকে নির্দেশ করে; যেমন— "লোকটা, লোকটি; বই-খানা, বই-খানি; লাঠি-গাছা" —এখানে "লোক, বই, লাঠি"— এই তিনটা বিশেষ্যের পরে "টা, টি; খানা, খানি; গাছা" বসিয়ে, এদের আকার- বা প্রকৃতি-সম্বন্ধে বক্তার ধারণা নির্দেশ করা হয়েছে।

(খ) সংখ্যা-বাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হলে, বিশেষ্যের পরে এই সংখ্যা-বাচক শব্দ বসলেই এইরূপ সুনির্দিষ্ট-ভাব প্রকটিত হয়; যেমন— "তিন-খানা বই = যে কোনও অনির্দিষ্ট তিন খানা বই," কিন্তু "বই তিন-খানা = সুনির্দিষ্ট।

(গ) সংখ্যা-বাচক বিশেষণের পূর্বে কতকগুলি নির্দেশক-শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করা হয়— "জন-দুই মানুষ, খান-চার কাপড়, গাছা-কতক লাঠি"।

এরূপ ক্ষেত্রে, অনির্দেশক-ভাবকে আরও ভাল করে প্রকাশ করবার জন্য, সংখ্যা-বাচক শব্দে অনিশ্চয়-বোধক প্রত্যয় "ক" যুক্ত করা যেতে পারে; যেমন— "জন-দুইয়েক মানুষ, খান-চারেক কাপড়, গাছা-পাঁচেক লাঠি, খান-আষ্টেক রুটি" ইত্যাদি।

(ঘ) পরিমাণ-বাচক বিশেষণের সঙ্গেও ঐরূপ নির্দেশক যুক্ত হয়; যেমন—"এতটা জল, এতখানি বেলা, এইটুকু দুধ, দুধটুকু" ইত্যাদি।

"টা, টি, টুকু, খানা" প্রভৃতি দিয়ে বস্তুর আকার-বা প্রকৃতি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "টি, খানি, গাছি"— এই প্রকার ই-কারান্ত রূপের সাহায্যে বস্তুর হ্রস্ব-ভাব বা এর প্রতি বক্তার আদর জ্ঞাপিত হয়।

"-টা"-র উৎপত্তি সংস্কৃত "বৃত্ত-" থেকে (বৃত্ত > বট্ট > অট্ট > টা, টি : যেমন— একবৃত্ত > একবট্ট > একটা; অঙ্গবৃত্ত> আঙট; স্নেহবৃত্ত >নেহটা, ন্যাওটা); "খানা" এসেছে "খণ্ড-" শব্দ থেকে।

"টা, টি"— যেখানে বস্তুটি পূর্ণ বা অখণ্ড রূপে ও তার সমগ্র গুণাবলি প্রকৃতিতে যুক্ত বলে ধরে নিই, সেখানেই "টা" (হ্রস্বার্থে ও আদরে "টি") প্রযুক্ত হয়।

অপ্রাণী-বাচক শব্দের উত্তর সাধারণত "টা, টি" এই নির্দেশক যুক্ত হয়।

মানব ও উচ্চশ্রেণির প্রাণীবাচক শব্দে "টা" যোগ করলে অনাদর প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে "টি" যোগ করলে কিঞ্চিৎ স্নেহভাব বা অনুকম্পা অথবা আদরের দ্যোতনা আসে; যেমন—"লোকটা অতি পাজি; মানুষটি বেশ ভাল; দুটা (চলিত বাংলার 'দুটো') ভাতের জন্য ছুটাছুটি; দুটা ভাত দাও; 'ওদের বাড়ির ছেলেটা খায় এতটা, নাচে যেন বুড়ো বাঁদরটা— আর আমাদের বাড়ির ছেলেটি খায় এতটা, আর নাচে যেন ঠাকুরটি' ইত্যাদি।

"খান, খানা" (হ্রস্বার্থে, আদরে বা অনুকম্পায় "খানি") "খণ্ড" -শব্দ থেকে জাত— সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না। যে বস্তু দ্বিখণ্ডিত-রূপে হতে পারে, এবং যার খণ্ড-বিশেষের কার্যকারিতা নষ্ট হয় না, এরূপ স্থলে "খান, খানা, খানি" শব্দের প্রয়োগ হয়।

বৃত্তাকার বস্তুর নামের সঙ্গে" খান, খানা, খানি" সাধারণত বসে না; যেমন— "গোলা-খানা, বল-খানা, রসগোল্লা-খানা" হয় না।

সমতল ও চতুরঙ্গ বস্তুর নামের সঙ্গেই এই শব্দ যুক্ত হয়;— "কাপড়-খানা"

"আমটা," কিন্তু 'আমের চাকলা-খানা"; 'মুণ্ডটা," কিন্তু "মুখখানি, মুখখানা"

গুণ-বাচক বস্তুর নামের সঙ্গে কচিৎ "খানা, খানি"-র প্রয়োগ হতে পারে : "ভাব-খানা ভাল নয়; ছুটি' গেল গরম-খানি"।

পরিমাণ-বাচক বিশেষণের সহযোগেও "টা, টি, খানা, খানি" প্রযুক্ত হয় : "এতখানি বা এতটা বেলা, এতখানা কাণ্ড হয়ে গেল, এতখানি জমি ছাড়া হবে না, অনেকখানি বা অনেকটা সোনা" ইত্যাদি।

পরিমাণে, অল্পার্থে ও আদরে, "টুক্, টুকু" কচিৎ "টু" প্রযুক্ত হয় : "এতটুকু জল, এতটুকু ছেলে"। হ্রস্বতার আধিক্য বুঝাতে গেলে, "টুকুন, টুকুনি" প্রযুক্ত হয় : "এত্তটুকুন ছেলে"।

"গাছ, গাছা, গাছি"— এটা বৃক্ষার্থক বাংলা "গাছ" শব্দের সঙ্গে অভিন্ন। এই নির্দেশটি অখণ্ড, সরু বা দীর্ঘ বস্তুর নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়; — "লাঠি-গাছি, খড়-গাছা, আখ-গাছা"। "গাছ+টা, গাছ+টি" মিলিত ভাবেও কচিৎ ব্যবহৃত হয়; যেমন— 'লাঠি-গাছাটি"।

প্রত্যুপকার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৮২০—১৮৯১

আলি ইবন্ আব্বস্ নামে এক ব্যক্তি, মামূন নামক খলিফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্নে, খলিফার নিকট বসিয়া আছি; এমন সময়ে হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলিফা, আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কাল আমার নিকটে উপস্থিত করিবে; তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইল, তিনি ওই ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া, অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম; যদি তিনি পলাইয়া যান, আমায় খলিফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনকার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কস আমার জন্মস্থান; নগরের যে অংশে বৃহৎ মসজিদ্ আছে তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কস্ নগরের বিশেষত যে অংশে আপনকার বাস তাহার উপর, জগদীশ্বরের সতত শুভ দৃষ্টি থাকুক। ওই অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি, এক সময়ে আমায় প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, বহু বৎসর পূর্বে, ডেমাস্কসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণ ভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলাম এবং গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া, গৃহস্বামী আমায় অভয়প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না; লজ্জাবশত আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানদিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে; আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্য সামগ্রী স্থাপিত হইয়াছে, আর, পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থানসময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময় সদাশয় আশ্রয়দাতা, আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন, এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন; তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতিস্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে, ওই স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখপ্রকাশপূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনও কোনও উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনও অংশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনাকার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাস কাল, আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম; সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম; আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম; এবং, কি দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলিফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচপ্রকৃতি লোক ঈর্ষাবশত শত্রুতা করিয়া, খলিফার নিকট আমার উপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে; তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ এবং এখানে আনীত হইয়াছি; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিকের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই; সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা নাই; বোধ করি, আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না; আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না; এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন হইলেন; এই বলিয়া, পাথেয়স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এজন্য আমার উপর খলিফার মর্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি আপনকার প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না; আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে, এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনই হইবে না। যাহাতে খলিফা আমার উপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া, তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনাকার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে; যদি আপনকার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও, আমার আর কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে, আমি খলিফার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্মাবতার, ওই ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে; অনুমতি হইলে সর্বশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তে আমার ও তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া খলিফা উদ্ধত বচনে বলিলেন, কি বলিতে চাও, বল। তখন সে ব্যক্তি, ডেমাস্কস নগরে, কীরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এক্ষণে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এজন্য তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক, তিনি কখনই দুরাচার

নহেন। নীচ প্রকৃতি পরহিংসক দুরাত্মারা, ঈর্ষাবশত অমূলক দোষারোপ করিয়া, তাঁহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; নতুবা, যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনও দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।

খলিফা, মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কর্ণগোচর করিয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, প্রসন্নবদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া, আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাঁহাকে অবিলম্বে এই শুভসংবাদ দাও ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক, তাঁহাকে খলিফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলিফা, অবলোকনমাত্র, প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া, অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া, খলিফা তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন; এবং ডেমাস্কসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয় স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

লেখক পরিচিতি



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর জন্ম ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে। দারিদ্র্য তাঁর মানসিকতাকে করে তুলেছে দুর্দমনীয়, তেজস্বী এবং অনমনীয় জেদি। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে মাত্র নয় বছর বয়সে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। অসাধারণ অধ্যয়ন স্পৃহা ও অসামান্য প্রতিভাবলে কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি এবং ন্যায়শাস্ত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হলেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তা ত্যাগ করেন। এবং প্রবেশ করেন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। মেট্রোপলিটান কলেজ তারই প্রথম ফলশ্রুতি। পরবর্তীকালে এর নামকরণ হয় বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়।

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাঁকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী" আখ্যায় ভূষিত করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', তাঁর অনূদিত গ্রন্থ। 'বোধোদয়' 'আখ্যানমঞ্জরী' 'বর্ণপরিচয়' ইত্যাদি অনেক ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাঙালি জাতির অশেষ উপকার সাধন করেছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

পাঠের মূল ভাব

আলি ইবন্ আব্বস নামে এক ব্যক্তি একদিন বিকেলে খলিফার সঙ্গে আলাপে রত ছিলেন। সেই সময় বন্দী অবস্থায় এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে আনা হলে তিনি আব্বসকে নির্দেশ দিলেন বন্দীকে তাঁর বাড়িতে রুদ্ধ করে রেখে পরদিন যেন খলিফার নিকট উপস্থিত করেন। আব্বস যথাযথ ভাবে খলিফার নির্দেশ পালন করেন। বন্দীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানতে পারেন ডেমাস্কসে বন্দীর বাসস্থান। আব্বসের মনে পড়ে যায় ডেমাস্কসের পদচ্যুত শাসনকর্তার আক্রমণে তিনি প্রাণরক্ষার আবেদন জানিয়ে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। গৃহস্বামী তাঁকে কেবল আশ্রয় প্রদান করেননি বিপদের মেঘ না-কাটা পর্যন্ত সযত্নে প্রায় মাসখানেক তাঁকে রেখেছিলেন। একদিন সুযোগ বুঝে বাগদাদে যাবার যাত্রীদের সঙ্গে তাঁকেও পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সঙ্গে সুসজ্জিত অশ্ব। খাদ্য সামগ্রী ও ভৃত্য ছিল। সে থেকে আব্বসের সবচেয়ে প্রিয়স্থান ডেমাস্কস।

ডেমাস্কসবাসী জেনে তিনি বন্দীকে সেই আশ্রয়দাতার কাহিনি বর্ণনা করে প্রত্যুপকার করতে না-পারার জন্য আক্ষেপ করেন। তারপর বন্দীই যে সেই আশ্রয়দাতা জেনে আব্বস পুলকিত হয়ে তাঁকে শৃঙ্খল মুক্ত করেন এবং সহস্র স্বর্ণমুদ্রার থলি প্রদান করে অবিলম্বে প্রস্থান করার অনুরোধ জানান।

প্রত্যুত্তরে বন্দী জানান একদিন যাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন আজ তার প্রাণ বিনাশের কারণ হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ নীচপ্রকৃতি লোকের ঈর্ষাবশত শত্রুতার ফলেই যে তাঁর বন্দীদশা, এই সত্য ঘটনা খলিফাকে জানালে তাঁর প্রতি খলিফার মনোভাব ও সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে। পরদিন আব্বস ক্রুদ্ধ খলিফাকে কাতর অনুনয় করে ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এবং এ কথাও বলেন— যে-ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক তিনি কখনোই দুরাচার নহেন। বিবেচক ও অতি উন্নতচিত্তের খলিফা তাঁর বন্দীর প্রকৃত পরিচয় জেনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উপহার সামগ্রী প্রদান করে সসম্মানে বিদায় করেন।

শব্দার্থ

খলিফা— ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা ও নৃপতি। প্রতীতি— বিশ্বাস। প্রত্যুপকার— উপকারের পরিবর্তে উপকার। সমভিব্যাহারে— সঙ্গে। সম্ভ্রান্ত— অভিজাত। প্রতিগমন— ফিরে যাওয়া। মৌনাবলম্বন— নীরব থাকা। পরিচর্যা— সেবা। আক্ষেপ— ক্ষোভ। অভিনিবেশ— মনোযোগ। নিরীক্ষণ— বিশেষ ভাবে লক্ষ করা। মনস্কাম— মনের ইচ্ছা। আলয়— বাড়ি। লৌহশৃঙ্খল— লোহার শিকল। উৎকট— তীব্র। অনুমাত্র— বিন্দুমাত্র, সামান্য। নীচাশয়— হীন অন্তঃকরণ। শপথ— প্রতিজ্ঞা। অমূলক— কাল্পনিক। অবধারিত— নিশ্চিত। উদ্ধত— অবিনীত। মহামতি— মহাত্মা। অব্যাহতি— মুক্তি। পাথেয়— যাতায়াতের সম্বল বা খরচ। প্রস্থান— গমন। অবিলম্ব— অতি শীঘ্র। অভিরুচি— ইচ্ছা, অভিলাষ।

টীকা

ডেমাস্কস

ডেমাস্কস বা দামাস্কাস হল সিরিয়ার রাজধানী। পৃথিবীর অন্যতম প্রচীন নগরী। বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক সিরিয়ার প্রতিষ্ঠা। এখানকার মোট জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ লোক মুসলমান।

বাগদাদ

মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র ইরাকের রাজধানী বাগদাদ। বাগদাদ একটি প্রদেশ। এটি বাগদাদ শহর ও তার আশপাশের পৌর এলাকাগুলি

নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে আলমামুদিয়াহ ও আবু গারিব। প্রদেশটির আয়তন ৭৩৪ বর্গ কিলোমিটার। বাগদাদ ইরাকের ক্ষুদ্রতম প্রদেশ। কিন্তু জনসংখ্যায় প্রথম। ২০০৩ সালের হিসেব অনুযায়ী বাগদাদে ৬৪ লক্ষ লোক বাস করেন।

খলিফা

খলিফা শব্দের অর্থ হল প্রতিনিধি। ধর্মনেতা। ইসলামি রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধান শাসনকর্তা। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর যে চারজন (হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলি) একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, তাঁরা একাধারে শাসনকর্তা এবং ধর্মীয় নেতা ছিলেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও প্রত্যুপকার করা মানব-চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। এই গুণ মানুষকে মহৎ হবার প্রেরণা দেয়। ছাত্রছাত্রীরা যাতে এই বিশেষ গুণটি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে প্রত্যুপকার পাঠটি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলি

১. (ক) সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

(ক) প্রত্যুপকার গল্পটি কোন পুরুষে লেখা?
(১) প্রথম পুরুষ (২) মধ্যম পুরুষ (৩) উত্তম পুরুষ। (৪) তৃতীয় পুরুষ।

(খ) হস্তপদবদ্ধ ব্যক্তির নিবাস কোথায়?
(১) বাগদাদ (২) ডেমাস্কস (৩) গ্রিস (৪) প্যারিস।

(গ) আলি ইবন আব্বস কোন দেশের লোক?
(১) বাগদাদ (২) লাহোর (৩) আফগানিস্তান (৪) ডামেস্কস।

(ঘ) খলিফার নাম কী?
(১) জসীমউদ্‌দীন (২) আলি ইবন আব্বস (৩) শহীদুল্লাহ (৪) মামুন।

(খ) সত্য ও অসত্য বেছে নাও।

(১) আব্বস খলিফার বিরাগ ভাজন ছিলেন।
(২) খলিফা মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন।
(৩) পরদিন অপরাহ্ণে আব্বস খলিফার নিকট উপস্থিত হইলেন।
(৪) এই পৃথিবীতে যত স্থান আছে ডেমাস্কস্ আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

(গ) পাঠ অবলম্বনে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(১) তিনি বলিলেন — আমার জন্মস্থান।
(২) আপনি কৃপা করিয়া আমার — করুন।
(৩) সদাশয় আশ্রয়দাতা আমার হস্তে একটি — থলি দিলেন।
(৪) তিনি — ডাকাইয়া প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।
(৫) এক্ষণে আপনার যেরূপ — হয় করুন।

২. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

(ক) বাংলা গদ্যের জনক কাকে বলা হয়?

(খ) আব্বস প্রাণরক্ষা করার জন্য আশ্রয়দাতার বাড়িতে কতদিন ছিলেন?

(গ) 'তোমা হইতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল'— বক্তা কে?

(ঘ) "আপনকার নিবাস কোথায়?"— আপনকার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(ঙ) 'প্রত্যুপকার' পাঠের লেখক কে?

(চ) 'প্রত্যুপকার' পাঠে কে, কার প্রত্যুপকার করেছেন?

৩. ৩/৪ টি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) "পৃথিবীতে যত স্থান আছে ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।"— উক্তিটির যাথার্থ্য বুঝিয়ে বলো।

(খ) 'আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে।'— কে, কাকে কোন প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন?

(গ) লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার পর বন্দী কীরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন?

(খ) বন্দীকে মুক্ত করার পর আব্বস তাঁকে কী বলেছিলেন?

(ঙ) আব্বসের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হননি কেন?

(চ) খলিফা যে উন্নতচিত্তের পুরুষ কীভাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির রচনামূলক উত্তর লেখো।

(ক) প্রত্যুপকার পাঠে কে, কীভাবে, প্রত্যুপকার করেছে আলোচনা করো।

(খ) প্রত্যুপকার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

(গ) প্রত্যুপকার পাঠে কোন চরিত্রটি তোমার ভালো লাগে এবং কেন তা তোমার নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

(ঘ) আলি ইবন আব্বসের আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার যথার্থ কারণ বিশ্লেষণ করো।

(ঙ) ডেমাস্কসবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উদ্দেশে আব্বস খলিফাকে যে সব যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা উল্লেখ করো।

৫. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

(ক) গৃহস্বামী আমায় অভয় প্রদান করিলেন।

(খ) যদি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না।

(গ) আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে, সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব।

(ঘ) যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক, তিনি কখনই দুরাচার নহেন।

৬. টীকা লেখো।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৭. পাঠভিত্তিক ব্যাকরণ

১। (ক) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো।**

প্রত্যুপকার; জগদীশ্বর; উদ্ধত; নির্ভয়; মৌনাবলম্বন; মনস্কাম; উল্লেখ; তজ্জন্য; দোষারোপ; সংবাদ; স্বাধীন; দুর্বিনীত।

(খ) **প্রত্যয় নির্ণয় করো।**

শ্রবণ; ঘাতক; তদীয়; গমন; বক্তব্য; আত্মীয়; ভৃত্য; ব্যক্তি; ব্যক্ত; দর্শন।

(গ) **বাক্য সংকোচন করো।**

উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে; যাহা মর্মকে বেদনা দেয়
ভরণের যোগ্য; মহতের ভাব;
যার দয়া আছে; যে পরের উপকার করে।

(ঘ) **উক্তি পরিবর্তন করো।**

(১) আব্বস গৃহস্বামীর নিকট কাতর প্রার্থনা করিলেন, "আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন।"

(২) খলিফা আমার প্রতি আজ্ঞা করিলেন, "তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া যাও।"

(৩) আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার নিবাস কোথায়?"

(ঙ) 'প্রত্যুপকার' পাঠটি থেকে দশটি তৎসম শব্দ খুঁজে বার করো।

(চ) 'প্রত্যুপকার' পাঠটি থেকে পাঁচটি না-বোধক বাক্য খুঁজে বার করো।

(ছ) বিদ্যাসাগর রচিত তিনখানি গ্রন্থের নাম বলো।

উ. বেতালপঞ্চবিংশতি, আখ্যানমঞ্জরী, আত্মচরিত

(জ) বিদ্যাসাগর অনুবাদিত তিনখানি গ্রন্থের নাম বলো।

২. **বাক্য রচনা করো।**

কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন; নিরীক্ষণ;
আলিঙ্গন; স্বার্থপর;
প্রতীতি; সমভিব্যাহারে;
মৌনাবলম্বন; অভিরুচি;
অমূলক; ন্যায়পরায়ণ।

৩. তোমারা জান এমন একটি পরোপকার সম্পর্কিত গল্প বন্ধুদের মধ্যে বলো।

৪. প্রকল্প রচনা করো। পরোপকার কাকে বলে? পরোপকারের দুটি গল্প চিত্র সহযোগে উপস্থাপন করো।

৫. বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সদস্য হবার আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানি আবেন -পত্র লেখো।

৬. তোমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো। (৬০০ শত শব্দের মধ্যে)

৭. (ক) নীচে দেওয়া শব্দছকে উপর-নীচে লম্বালম্বি ভাবে বর্ণমালা বসিয়ে শব্দ তৈরি করো। উত্তর। যেমন— শেরশাহ।

(খ) উপর নীচে বর্ণমালা বসিয়ে শব্দ তৈরি হবার পর দেখো পাশাপাশি আর কী শব্দ তৈরি হয়েছে। সেগুলি লেখো।

শে	খ	র	দা	শ

পিতৃস্নেহ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩—১৯১৩

(স্থান—চাণক্যের বাটী। কাল—প্রভাত। চাণক্য একাকী।)

চাণক্য। একটা সমুদ্র— তরঙ্গহীন, শব্দহীন, অন্তহীন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মতো স্থির। [ধীরে ধীরে পদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন] — ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ কর্তে পারে না। হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙক্ষা, গৈরিক নিস্রাবের মতো উঠে, ভস্ম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তস্থতম স্তর থেকে উঠে মস্তিষ্কের তীব্রজ্বালাস্পর্শে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। [পরে স্থির নেত্রে দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কহিলেন]— এই সুন্দর প্রভাত, ওই গাঢ় নীলিমা— এক দিন ছিল— কে?

(প্রহরীবেষ্টিত কাত্যায়নের প্রবেশ)

চাণক্য। এই যে এসেছো বন্ধু।

কাত্যায়ন। ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি চাণক্য। আমি তোমার বন্দী। অন্যায় করেছি শাস্তি দাও।

চাণক্য। বন্ধন উন্মোচন করে দাও প্রহরী!

[প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল।]

চাণক্য। এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই।

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই-ই বটে! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী।

চাণক্য। তোমাবা বাইরে যাও।

[প্রহরীগণ চলিয়া গেল।]

চাণক্য। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই বন্ধু।

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই। —তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্তেই আমার জীবন শেষ মুহূর্ত হতে পারে। আমি বন্দী আর তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা।

চাণক্য। এই ছোরা নাও। আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও। তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর।

[ছোরা দিলেন]

কাত্যায়ন। তোমার অভিপ্রায় কী চাণক্য?

চাণক্য। আমি সাম্রাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার করে দিয়েছি। এই উষর প্রান্তরকে উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করেছি। তুমি যা পার নাই। এই বিশাল সাম্রাজ্যে একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ করছে। বাইরে শত্রুগণ ত্রস্ত। রাজপথপার্শ্বে

সম্পত্তি রেখে পথিক নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারে। কিন্তু এই বিরাট শান্তি পর্বতের মতো স্থির, নিষ্প্রাণ। না, আমি পারি নাই। তুমি হয় তো পার্বে। মন্ত্রিত্ব চাও, ছেড়ে দিচ্ছি।

কাত্যায়ন। তুমি কূট। তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য।

চাণক্য। আমি এই পৈতা ছুঁয়ে বলছি— আমি এই মুহূর্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করছি— তুমি যদি চাও। তুমি মূর্খ, কিন্তু তোমার হৃদয় আছে। তুমি পার্বে, আমি পারি নাই।

কাত্যায়ন। সে কি! ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে ক্ষমতার শিখরে উঠিয়ে—

চাণক্য। সব ভ্রম! হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না। আমি বুঝেছি যে আমার কঠোর শাসনে যে ক্ষমতা স্বপ্নের প্রাসাদের মতো অভ্র ভেদ করে উঠেছে, তা স্বপ্নের প্রাসাদের ন্যায় আকাশে লীন হয়ে যাবে। এ বাড়ি নয়, এই ইটের পাঁজা। এ বৃক্ষ নয়, এ শুষ্ক কাষ্ঠের গুচ্ছ। ব্রাহ্মণের নির্জীব ক্ষমতাকে পুনরায় মন্ত্রবলে গড়ে তুলতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়ে আনতে পারি না। শূদ্রকে চোখ রাঙিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তার হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না। রাক্ষসি, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্? আমি কী করেছি। কী করেছি।

কাত্যায়ন। কী করেছো?

চাণক্য। ওই বৌদ্ধ ধর্মের বন্যা আসছে। আমি দূর ভবিষ্যতে কী দেখছি জান?

কাত্যায়ন। কী?

চাণক্য। এই পুনরায় বিখণ্ড সাম্রাজ্যের উপর প্রেতের ভৈরব নৃত্য! তারপর এক মহাশক্তি এসে এই গলিত শবের উপর তার জাদুদণ্ড দুলিয়ে সেই বিখণ্ড মাংস-পিণ্ডগুলিকে এক করে নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত করবে; তারপর ন্যায়শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চষে সমভূমি করবে! নাও এ মন্ত্রিত্ব।

কাত্যায়ন। কি দামে বিকোচ্ছ?

চাণক্য। তোমার বন্ধুত্ব চাই, এইমাত্র।

কাত্যায়ন। উত্তম অভিনয়।

চাণক্য। অভিনয় নয়, বিশ্বাস কর বন্ধু; আজ আমি বড় দীন। চাণক্য কূট, কৌশলী, বিচক্ষণ। চাণক্য ভারতে জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহাসংগীত রচনা করেছে। আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হলে তিনি চাণক্যের এই মহাসৃষ্টি মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন। সব করেছি। কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। পারব কোথায় থেকে! বাইরে এই অদ্ভুত মনীষা দেখছ, কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ বন্ধু! এ এক শুষ্ক মরুভূমি— এক কণা করুণা নাই, স্নেহ নাই, বিশ্বাস নাই; শাঁস নাই, খোসা নিয়ে কি করব? ভেঙে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেই।—

[বক্ষে করাঘাত]

কাত্যায়ন। আশ্চর্য! তুমি অধীর চাণক্য! এই দুর্দম তেজ, এই অটল প্রতিজ্ঞা, এই তীক্ষ্ণ, বুদ্ধি—

চাণক্য। বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি! শুনতে শুনতে অধীর হয়ে গেছি। পথে ঘাটে, প্রান্তরে বিশ্বশুদ্ধ ওই এক কথা — চাণক্যের কি বুদ্ধি! সমস্ত জগৎ নির্নিমেষ বিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে দেখছে— যেমন লোকে বিভীষিকা দেখে! ধুমকেতু দেখে! যে বুদ্ধিকে এতদিন আমি দৈববাণীর মতো অনুসরণ করে এসেছি— সে বর নয়, অভিশাপ। এখন সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ দেখতে পেয়েছি; সে সজীব মূর্তি নয়, সে কঙ্কাল। সে

এতদিন আমায় চালিয়ে যাচ্ছিল। —এখন তাড়া করেছে—ভয়ঙ্কর!

[শিহরিয়া উঠিলেন]

কাত্যায়ন। তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ চাণক্য।

চাণক্য। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] এই সুন্দর প্রভাত! ধরণী বিবাহের কন্যার মতো সেজেছে। তার মুখের উপর সূর্যের স্বর্ণরশ্মি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো এসে পড়েছে। আর সৃষ্টিছাড়া আমি দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মতো দাঁড়িয়ে তাই দেখছি।

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য। এই সুন্দর হাস্যময় জগৎ— আর আমি তার কেউ নয়। একা আমি এই অসীম সৌন্দর্য্যরাজ্য থেকে নির্বাসিত! বিশ্বে অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে— আর পঙ্গু, আমি তাপিত তৃষিত হৃদয়ে তীরে ছটফট করছি— তপোবনের প্রান্তে শূকরের মতো পল্বলপঙ্কে পড়ে আছি।

কাত্যায়ন। আশ্চর্য! এরূপ কখনো দেখি নাই।

চাণক্য। তবু একদিন ছিল—

[দূরে সংগীত]

চাণক্য। তবু একদিন ছিল, যেদিন সংসার আমার কাছে উৎসব মন্দির বলে বোধ হত, পৃথিবীর উপর দিয়ে সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত হয়ে যেত, আকাশ ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত বোধ হত। তার পর—

[সংগীত নিকটবর্তী হইল]

চাণক্য। [উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া] সেই স্বর —কাত্যায়ন! বন্ধু! ডেকে আন!

কাত্যায়ন। কাকে?

চাণক্য। ঐ ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন। সে কি! তুমি কি—

চাণক্য। [সানুনয়ে] যাও ভাই—

[কাত্যায়নের প্রস্থান]

চাণক্য। কেমন এমন হয়! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয়।

[ঘর্ম মুছিলেন।
গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ, সঙ্গে কাত্যায়ন]

গীত

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"
বলে "আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথায়? চির শ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে।।'
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে

ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে,
দেখ ওই সুধাসিন্ধু, উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে!
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে।।
কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ;
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ!
ওরে, সেই পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পুরের কাছে, পড়ে আছিস্ পরবাসে।।

কাত্যায়ন। এমন দার্শনিক ভিক্ষুক ত পূর্বে কখনো দেখি নাই। "তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণপদঃ কর্ম্মধারয়ঃ"—অর্থাৎ কি না— সেই এক পুরুষ প্রকৃতির সহিত সমগুণান্বিত হইলে— অর্থাৎ জীবভাবে জন্মগ্রহণ করিলে, কর্ম ধারণ করায়— আর কাজেই কর্মফল ভোগ করে— উঃ ভিক্ষুক, তুমি পাণিনি পড়েছ নিশ্চয়।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু তোমার গানের প্রতি ছত্রে পাণিনি। এ সব গান শিখলে কার কাছে।

ভিক্ষুক। এক ব্রাহ্মণের কাছে বাবা।

কাত্যায়ন। হতেই হবে।

চাণক্য। [বালিকাকে] এই দিকে এসো ত মা!

[বালিকা দৌড়িয়া চাণক্যের কাছে আসিল।]

চাণক্য। [তাহাব মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে] একেবারে সেই মুখ! সেই চক্ষু দুটি! একেবারে— অথচ— ভিক্ষুক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— এ তোমার কন্যা? সত্য বল।

ভিক্ষুক। আমারই বৈ কি? আর কার?

চাণক্য। সত্য বল। তোমায় প্রচুর অর্থ দিব। সত্য বল।

ভিক্ষুক। না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মানিক কুড়িয়ে পেয়েছি। তবে সেই অবধি একে নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছি বাবা।

চাণক্য। [সাগ্রহে] তবে তোমার মেয়ে নয়?

ভিক্ষুক। না বাবা! কুড়িয়ে পেয়েছি।

চাণক্য। কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক। ভগবান্ দিয়েছেন। নইলে এই অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধরে নিয়ে বেড়াত? কি পুণ্যে মাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি করে খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দুটি হারিয়েছি।

চাণক্য। [সমধিক আগ্রহে] দস্যু ছিলে! ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ?

ভিক্ষুক। দিইছি বৈ কি বাবা! কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে?

চাণক্য। মেয়ে কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক। অবন্তীপুরে বাবা!

চাণক্য। [উত্তেজিত ভাবে] অবন্তীপুরে? কোন্ জায়গায়?

ভিক্ষুক। পথে।

চাণক্য। না, এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি করে এনেছিলে? সত্য বল—কোনো ভয় নাই—চুরি করেছিলে?

ভিক্ষুক। না, বাবা!

চাণক্য। হত্যা করব।— সত্য বল! ডাকাতি করে এনেছিলে?

ভিক্ষুক। হাঁ বাবা!

চাণক্য। নদীর ধারে বাড়ি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ।

চাণক্য। [বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া] হৃদয় উদ্বেল হয়ো না। তখন এর বয়স?

ভিক্ষুক। তিন কি চার বৎসর বাবা!

চাণক্য। এর নাম বলেছিল?

ভিক্ষুক। আত্তিরি।

চাণক্য। আত্রেয়ী! শুনছো কাত্যায়ন! বলেছে আত্রেয়ী।— এর বাপের নাম?

ভিক্ষুক। চাণক্য।

চাণক্য। [লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে] দস্যু! — না— তোমায় মারবো। না। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করব না। কোনো ভয় নাই। কাত্যায়ন—না, রক্ষী!

[রক্ষীগণের প্রবেশ]

চাণক্য। না, যাও।—ভিক্ষুক! আমি সেই ব্রাহ্মণ। এ কন্যা আমার।

[রক্ষীগণের প্রস্থান]

ভিক্ষুক। আমার মেয়েটি কেড়ে নিও না বাবা। এই আমার অন্ধের নড়ি। খেতে পাব না।

চাণক্য। তোমায় এক রাজ্যখণ্ড দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারি করেছ! তুমি আমায় সম্রাট করেছ। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ করে আবার স্বর্গে উঠিয়েছ। আমি তোমায় বধ করে তোমার মূর্তি গড়িয়ে পূজা করব। না, না— এ কি! এ আনন্দ না দুঃখ? এ যে— এ যে— না, একটা কিছু করতে হবে; যাতে বুঝতে পারি যে আমি বেঁচে আছি।

[হাস্য]

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য। কাত্যায়ন! নাড়ী দেখতে জান? দেখ ত [হাত বাড়াইলেন] আমি বেঁচে আছি কি না? দেখ ত এ ইহকাল, না পরকাল? এ স্বপ্ন, না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সংগীত, না প্রলয়-কল্লোল?— দেখ ত! নহিলে— সম্ভব এতদিন পরে আমারই কন্যা— ভারতের শাসনকর্তার কন্যা— তারই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা করতে! — কাত্যায়ন! কাত্যায়ন!

[ক্রন্দন]

কাত্যায়ন। চাণক্য, প্রকৃতিস্থ হও।

চাণক্য। না, এ সম্ভবে না। এ ছলনা; প্রতারণা; ষড়যন্ত্র। তোমার ষড়যন্ত্র কাত্যায়ন! —না, এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ী— মা আমার! এতদিন সন্তানকে ভুলে ছিলি! — কোথায় ছিলি পাষাণী মা। [কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন] — কাত্যায়ন! শোনো, কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠছে না? দেখ, ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ-সৌরভ-হিল্লোল ভেসে আসছে! আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আমায় কুটীরে নিয়ে চল কাত্যায়ন!

(সংক্ষেপিত)

নাট্যকার পরিচিতি



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি ও সম্মানের আসন অধিকার করে আছেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। তাঁর মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন শান্তিপুরের 'অদ্বৈত ঠাকুরের' বংশধর। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৩ সালে তিনি হুগলি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি.এ এবং, ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর মানসিকতা ও শিল্পস্বাতন্ত্র্য নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক পারিবারিক সব ধরনের নাটকই তিনি লিখেছিলেন। তবে ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। প্রহসন, হাসির গান, দেশাত্ববোধক গান রচনাতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর 'সাজাহান' 'নুরজাহান', 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপসিং', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংখ্যা মোট ১৪ টি। ১৯১৩ সালের ১৭ মে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলোচ্য নাট্যাংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সংকলিত নাট্যাংশটি পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই নাটকে সন্তান-স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে। পিতৃ-মাতৃ-সমাজ পরিবেষ্টিত যে আত্মীয়তা, তার মধুর সম্পর্কের রূপ এই নাটকে দ্যোতিত হয়েছে। মানবীয় মূল্যবোধের এক সুস্নিগ্ধপরিচয়ও শিক্ষার্থীরা এখানে পাবে।

শব্দার্থ

রোমাঞ্চ—শিহরন। ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ, উপহাস। ভস্ম—ছাই। প্রান্তর—মাঠ। নিরীক্ষণ—দেখা। উন্মোচন—খুলে দেওয়া। অভিপ্রায়—ইচ্ছা। অভিসন্ধি—চক্রান্ত। নিষ্প্রাণ—প্রাণহীন। লীন—মিশে যাওয়া। প্রকৃতিস্থ—শান্ত। উৎস—উৎপত্তি স্থান। বসুন্ধরা—পৃথিবী। উষর—অনুর্বর। প্রভেদ—পার্থক্য। বিভীষিকা—আতঙ্ক। সৌরভ—পরিমল, ফুলের গন্ধ। পঙ্গু—বিকলাঙ্গ।

১. টীকা লেখো

চাণক্য

চাণক্য হলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁরই নির্দেশে ও পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। চাণক্য ছিলেন কুশাগ্রবুদ্ধি, তেজস্বী ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। অবন্তীপুরে কৃষ্ণা নদীতীরে চাণক্যের বাড়ি ছিল। ভক্তিমতী স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা আত্রেয়ীকে নিয়ে তাঁর সংসার জীবন সুন্দর ভাবে কেটেছিল। মহারাজ নন্দ তাঁর নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে তাঁর দুঃখের জীবন শুরু হয়। অকালে তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। অবশেষে দস্যু তাঁর কন্যাকে অপহরণ করলে তিনি সর্বরিক্ত হন এবং নন্দবংশ ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন।

কাত্যায়ন

চাণক্যের অনুপ্রেরণাদাতা। মহারাজ নন্দ কাত্যায়নের সাত পুত্রকে তিলে তিলে অনাহারে হত্যা করলে, কাত্যায়ন নন্দের মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্য নিতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। একদা কাত্যায়ন মহারাজের মন্ত্রী ছিলেন। পরে কাত্যায়ন পুত্র হত্যার প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যে চাণক্যের রাজপুরোহিত নির্বাচিত হন। পরে দুই ব্রাহ্মণ বন্ধু মিলে নন্দ বংশ ধ্বংস করেন।

পাণিনি

পাণিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একজন প্রথিত-যশা বৈয়াকরণিক। তাঁকে সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠাতা ও জনকের মর্যাদা দেওয়া হয়। তাঁর ব্যাকরণ-গ্রন্থের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। প্রাচীন ভারতের আর্য ভাষার দুটি রূপ— প্রাচীন আর্য বা বৈদিক ভাষা, ও অর্বাচীন আর্য বা সংস্কৃত ভাষা। পাণিনি এই দুই ভাষার পার্থক্যকে ছন্দস ও ভাষা নামে অভিহিত করেছেন। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪ শতকে বর্তমান ছিলেন।

২. পাঠের জ্ঞাতব্য বিষয়

হৃদয়হীন জ্ঞান ও বুদ্ধি যে প্রলয় সৃষ্টি করতে পারে তা চাণক্য বুঝতে পেরেছেন। তিনি বুঝেছেন যে সৃষ্টির জন্য হৃদয়ের প্রয়োজন। বিপুল খ্যাতি ও গৌরব লাভ হৃদয়ের খোরাক পূর্ণ করতে পারে না। প্রহরীবেষ্টিত বন্দী কাত্যায়নের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চাণক্যের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। কাত্যায়নকে চাণক্য বন্ধু বলে সম্বোধন করলে কাত্যায়ন কিন্তু শিরোমণি চাণক্যকে বিশ্বাস করতে পারেননি। চাণক্য কাত্যায়নের মনে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য কাত্যায়নকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তাঁকে মুক্তি দিতে বলেন। কাত্যায়ন চাণক্যের অভিপ্রায়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। চাণক্য তাঁকে জানান যে, হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসনকার্য চলে না। তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত। কাত্যায়নকে তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে বলেন। কারণ তাঁর হৃদয় আছে। সেই মুহূর্তে এক ভিক্ষুকবালা ও ভিক্ষুকের আগমন ঘটে। চাণক্য ভিক্ষুকের কাছে জানতে পারেন যে চাণক্য-গৃহ থেকে এ ভিক্ষুকবালাকে এক দস্যু হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল।

চাণক্য নিজ কন্যাকে এতদিন পরে ফিরে পেয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেন। তিনি প্রথমে দস্যুকে বন্দী করতে আদেশ দিলেও পরে তাঁর উদ্বেল-চিত্ত কন্যা হরণকারী দস্যুকে ক্ষমা করে দেয়। হারানো কন্যাকে ফিরে পেয়ে চাণক্যের সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

৩. ক্রিয়াকলাপ

শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন করো।

(ক) চাণক্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন?
(১) এক সৈন্য (২) মন্ত্রী (৩) রক্ষী (৪) বন্ধু।

(খ) চাণক্যের কন্যার নাম কী ছিল?
(১) মুরা (২) হেলেন (৩) ছায়া (৪) আত্রেয়ী।

(গ) আত্রেয়ীদের বাড়ি কোথায় ছিল?

(১) শোণিতপুর (২) অবন্তীপুর (৩) গৌরীপুর (৪) অভয়াপুর

(ঘ) চাণক্য কোন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন?

(১) শূদ্র (২) ক্ষত্রিয় (৩) ব্রাহ্মণ (৪) বৈশ্য।

(ঙ) আত্রেয়ীকে চুরি করেছিল———

(১) এক চোর (২) এক ব্রাহ্মণ (৩) এক দস্যু (৪) এক ঠগবাজ।

৩. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(ক) হৃদয়কে উপবাসী রেখে———চলে না।

(খ) তোমার ——— পথ পরিষ্কার কর।

(গ) আমি তাপিত ———হৃদয়ে তীরে ছট্‌ফট্ করছি।

(ঘ) তোমার——— বোঝা আমার অসাধ্য।

(ঙ) যতদূর দেখা যাচ্ছে, ———মৃত্যুর মতো স্থির।

৫. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।

(ক) চাণক্য কে ছিলেন?

(খ) 'পিতৃস্নেহ' পাঠের 'পিতা' কে?

(গ) 'পিতৃস্নেহ' পাঠটি কোন নাটকের অন্তর্গত?

(ঘ) 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের নাট্যকার কে?

(ঙ) কাত্যায়ন কে ছিলেন?

(চ) চাণক্যের কন্যাকে কে চুরি করেছিল?

(ছ) ব্রাহ্মণ চাণক্য কোন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন?

(জ) ভিক্ষুকটি প্রথম জীবনে কী করত?

(ঝ) আত্রেয়ীকে কত বছর বয়সে ডাকাত চুরি করেছিল?

(ঞ) ভিক্ষুকবালা প্রকৃতপক্ষে কার কন্যা ছিল?

৬. সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।

(ক) চাণক্যের পরিচয় দাও।

(খ) ভিক্ষুকটি আত্রেয়ীকে কেন, কোথায় কীভাবে চুরি করেছিল?

(গ) চাণক্যের পারিবারিক জীবনের পরিচয় দাও।

(ঘ) পিতা ও কন্যার মিলন দৃশ্যটি সংক্ষেপে লেখো।

(ঙ) চাণক্যের মনে কী করে প্রতিহিংসার জন্ম হয়েছিল?

(চ) কাত্যায়নের পরিচয় দাও।

৭. রচনাধর্মী উত্তর দাও।

(ক) চাণক্যের চরিত্র আলোচনা করো।

(খ) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় দাও।

(গ) 'পিতৃস্নেহ' নাটকের সারাংশ লেখো।

(ঘ) "ক্ষমতা স্নেহের অভাবকে পূর্ণ করতে পারে না"—আলোচনা করো।

৮. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

(ক) "এ এক শুষ্ক মরুভূমি— এক কণা করুণা নাই, স্নেহ নাই।

(খ) বিশ্বাস নাই, শাঁস নাই, খোসা নিয়ে কী করব?

(গ) "কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে?"

(ঘ) "আমি তোমায় বধ করে তোমার মূর্তি গড়িয়ে পূজা করব"

(ঙ) "যে বুদ্ধিকে আমি দৈববাণীর মতো অনুসরণ করে এসেছি— সে বর নয় অভিশাপ।"

৯. তাৎপর্য লেখো।

(ক) "তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্তেই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হতে পারে।"

(খ) "হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না।"

(গ) "অভিনয় নয়, বিশ্বাস কর বন্ধু; আজ আমি বড় দীন।"

(ঘ) পথে এ মানিক কুড়িয়ে পেয়েছি।

১০. ভাষা বিষয়ক (ব্যাকরণ)

(ক) বাক্যরচনা করো।

অন্তহীন— হৃদয়ে অন্তহীন আশা নিয়ে বৃদ্ধটি বেঁচে আছে।

তরঙ্গহীন— সমুদ্রের জলরাশি কখনো তরঙ্গহীন হয় না।

অভিশাপ— মায়ের অভিশাপ আছে বলেই ছেলের সংসারে উন্নতির আশা নেই।

নিজে করো : শব্দহীন, বাক্যহীন, ঊষর, অভিনয় উচ্ছ্বাস, প্রলয়-কল্লোল, ভয়ংকর

(খ) পদান্তর করো।

ভ্রম— ভ্রান্ত, মন্ত্রি— মন্ত্রিত্ব, নীল— নীলিমা, উন্মোচন— উন্মোচিত, ব্রাহ্মণ— **ব্রাহ্মণত্ব।**

নিজে করো ঈশ্বর, বন্ধু, সুন্দর, দর্শন, সত্য, উত্তেজনা, চুরি, উচ্ছ্বসিত, নির্বাসন, **অবসন্ন,** রোমাঞ্চ, প্রতারণা, প্রভু।

(গ) বাক্য পরিবর্তন করো।

১) এখন তুমি মুক্ত (অস্ত্যর্থক)
এখন তুমি বন্দী নও (নাস্ত্যর্থক)

২) তোমার অভিসন্ধি বুঝতে পারা আমার সাধ্য নয় (নাস্ত্যর্থক)
তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য (অস্ত্যর্থক)

৩) এইরূপ দৃশ্য কখনও আমি দেখিনি (নাস্ত্যর্থক)
এরূপ দৃশ্য আমার অদেখা (অস্ত্যর্থক)

৪) আজ আমি ধনি নই (নাস্ত্যর্থক)
আজ আমি বড় নির্ধন (অস্ত্যর্থক)

(ঙ) প্রতিবেদন লেখো। বিষয় — অসমের গণ্ডার

(চ) প্রধান শিক্ষকের নিকট ছুটির আবেদন-পত্র লেখো। বিষয়— **ফুটবল বা ক্রিকেট ম্যাচ।**

ভারতপথিক রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৬১—১৯৪১

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল; কিন্তু সব চেয়ে বড়ো তার দান— দেশকে সে দেয় গতি। দূরের সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখায়িত করে নদী, স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তা হলে মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন-উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়-মিলনের পথ হয় দুর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় পৃথক, অন্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।



রামমোহন রায়

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে-চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজর মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়— যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃন্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি— এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার।

শত শত বৎসর চলে গেল— ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর-দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ।

ঘুমের অবস্থায় মনের জানালা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবল মাত্র সেই সুপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অদ্ভুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তবরাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারো প্রবেশের পথ নেই।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ, তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল পৃথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছে।

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত, সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা করে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না; অতিথিরূপে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারেনি, দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নতুন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়— বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।

এই বেড়া ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্‌ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভুত, এত প্রবল।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্‌ভাবনী শক্তি বল লাভ করে। মানুষকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়যাত্রার ইতিহাস। কঠিন বাধা দূর করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার সম্পদ। এইজন্যেই বলেছে, বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্গমকে সুগম করতে এসেছে মানুষ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ।

ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে সেই গ্রন্থিকেই সনাতন বলে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়। যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়। — মানব সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানে দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে। ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটেনি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাসিং জানতাম— এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ, এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল; তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে— এ ফসল বালিতে উৎপন্ন হয়নি, হয়েছে মাটিতে। মরুভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটাব দ্বারা নিজকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করেনি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা যখন সমৃদ্ধিবান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে, এবং কৃষি প্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকি; কেবল একটা কথা মনে রাখিনে, এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই

থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যত্নকেও আমরা দাবি করি, ফসলের প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ বুজে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিত্যরূপে রক্ষা করবার চেষ্টায় সতর্ক হয়ে থাকি। প্রজারা যেখানে বিভক্ত সেখানে ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বেঁধে রাখে। তাও বেশিদিন টেকে না, কেবলই হাতবদল হতে থাকে। যেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ সেখানে কেবল রাষ্ট্রশক্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।

ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আর-এক জন ছিলেন দাদু। তিনি বলেন— ভাই রে, আমার পথ এই রকম, সে দুই পক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক।

ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্‌রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে।

আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান কারো স্থান সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে। স্বীকৃতি আছে।

য়ুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্ত্রীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিকভাবে য়ুরোপের একান্ত ছিল না। একদিন য়ুরোপের ধর্মমূঢ় বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতায় জ্বলতে জ্বলতে একলা জিয়োর্ডানো দিয়েছিলেন য়ুরোপীয় চিত্তের পরিচয়, যে চিত্তকে সে যুগের সাম্প্রদায়িক জড়বুদ্ধি দল বেঁধে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যাকে আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম, দেখেছিলুম মানুষের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার পরে তার ঘৃণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা।

একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে, সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বরচিত; লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্‌কৃত করে ভারত সভ্যতার প্রতিবাদ করে, তবু বলব এ কথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত

করেছিল— তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খ্রিস্টানকে, ভারতের সর্বজনকে, হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে
দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যাননি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেন না তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই— তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদুর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।

রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারিনি। আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগদ্দল পাথব ভারতের বুকে চেপে আছে, লজ্জায় আমরা সংকুচিত, দুঃখে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তবু আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে।

বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নতুন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে।

তিনি দেখিয়েছিলেন আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরন্তন প্রতিষ্ঠা, মনের স্বাস্থ্যকে— আত্মার শক্তিকে প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে ভারতের একান্ত আপন যে সাধন সম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন।

এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে; রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক— সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলনার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে তাই উদ্‌ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।

(সংক্ষেপিত)

পাঠ-প্রসঙ্গ

'ভারতপথিক রামমোহন রায়' পাঠে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন। রামমোহনকে তিনি বলেছেন 'ভারতপথিক'। ভারতবর্ষের 'ঐক্যের সাধনার মর্মবাণীর প্রধান উদ্‌গাতা ছিলেন রামমোহন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে সমগ্র জাতি কী-করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হতে পারে তার পথ নির্দেশ করে গেছেন রামমোহন। মানুষের প্রকৃত সাধনা হওয়া উচিত সমস্ত হীনতা ও জড়বুদ্ধি তথা কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে মিলনের সাধনায় নিমগ্ন হওয়া।

দেশের নব প্রজন্ম তথা কিশোর প্রাণে জীবনের সারস্বত বাণী একতার মন্ত্র উজ্জীবিত করার লক্ষে এই রামমোহন-চরিত পাঠ সময়োপযোগী।

শব্দার্থ

প্রাণবান—জীবন্ত, সতেজ। স্থাবর—স্থলভূমি। মর্মে—অন্তরে। চলৎপ্রবাহ—চলনশীলতা, গতিশীলতা। নদীমাতৃক—নদী যেখানে মাতা। প্রাচুর্য—ভরপুর অবস্থা, অঢেল। দুর্গম—যেখানে সহজে যাওয়া যায় না। মনন—চিন্তন। পুরোগামিনী—অগ্রগামিনী, পূর্বগামিনী। সংকীর্ণ—অপ্রশস্ত। বিকীর্ণ—বিকিরণ, বিভিন্ন দিকে বিক্ষেপ। অসংলগ্ন—সংযোগহীন। বিঘ্ন—বাধা, বিপত্তি। অবরুদ্ধ—যা বাঁধা পড়ে আছে, অবরোধ করা হয়েছে এমন। সুপ্ত—ঘুমন্ত, নিদ্রিত। আবর্তিত—ঘূর্ণমান। উৎকট—অদ্ভুত। আচার—সংস্কার, রীতি, রেওয়াজ। আচ্ছন্ন—ঢাকা। আত্মবিস্মৃত—নিজেকে ভুলে থাকা; আপনভোলা। প্রদোষ—সূর্য উদয় বা অস্তের প্রাক মুহূর্ত। আবৃত—ঢাকা। অভ্যর্থনা—আপ্যায়ন, সমাদর। উৎসুক—আগ্রহী, কৌতূহলী। বিতৃষ্ণা—বিরক্তি। নিহিতার্থ—যে অর্থ বা তাৎপর্য লুকনো আছে। নিরন্তর—অন্তহীন, অহরহ। প্রয়াস—চেষ্টা। পরিত্রাণ—মুক্তি। মূঢ়তা—বোকামি। দুরূহ—কঠিন, দুরধিগম্য, সহজে বোধগম্য নয় এমন। বিশ্লিষ্ট—বিচ্ছিন্ন, আলাদা-আলাদা, সংযোগহীন। পরিপোষণ—প্রতিপালন। কার্পণ্য—কৃপণতা। বর্বর—অ-সভ্য, বা সভ্য নয়। শৈথিল্য—ঢিলেমি, শিথিলতা। শাশ্বত—চিরন্তন। অগ্রণী—সর্বাগ্রে যিনি এসেছেন। নিবিড়— গাঢ়, ঘন, গহিন। পিঞ্জর—খাঁচা, পিঞ্জিরা। অতন্দ্র—নিদ্রাহীন। জড়ত্বপুঞ্জ—জড়তারাশি, স্থবিরতা। যথার্থ—প্রকৃত, সঠিক। প্রদীপ্ত—প্রোজ্জ্বল, বিশেষভাবে দীপ্ত, উজ্জ্বল। জড়বুদ্ধি—যে জ্ঞান বা বুদ্ধি সংস্কারে, জড়তায় আচ্ছন্ন। অনুকম্পা—দয়া, প্রীতিপূর্ণ মনোভাব। বিমুখ—মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, উপেক্ষা। সর্বতোমুখী—সকল দিকে মুখবিশিষ্ট, সর্বদিগ্‌বতী। জগদ্দল—জগৎ দলন করে যা, এমন জডভার যে নড়ানো যায় না। জীর্ণ—শুকনো, ভঙ্গুর। একমেবাদ্বিতীয়—এক এবং অদ্বিতীয়।

টীকা

রামমোহন রায় : জন্ম আনুমানিক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে সেকালের হুগলি জেলার কৃষ্ণনগরে। তাঁর কৌলিক পদবি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় নবাব সিরাজদ্দৌলার কর্মচারী ছিলেন। জননীর নাম তারিণী দেবী। রামমোহন আরবি, ফারসি, উর্দু, গ্রিক, লাতিন প্রভৃতি ভাষা জানতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ(১৮১৮) 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' অন্যতম। সতীদাহ প্রথা নিবারণে (১৮২৯) তাঁর অবদান অপরিসীম। মোগল সম্রাট ২য় আকবার তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন, ১৮৩০ সালে। ১৮৩৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

ক. দুটি প্রাচীন সভ্যতার নাম লেখো।

খ. সিন্ধু সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা।

গ. নদীর সবচেয়ে বড় দান কী?

উ: নদী দেশকে দেয় গতি।

ঘ. নীদমাতৃক কথার অর্থ কী?

ঙ. 'বেদাহম্' শব্দের অর্থ কী?

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

ক. দেশের প্রতি নদীর দান কী?

খ. 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'— শ্লোকটি কোন গ্রন্থে আছে? এর অর্থ কী?

উ. তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে। এর অর্থ সকলে আসুক সকল দিক থেকে।

গ. মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়?

ঘ. ভারতবর্ষে আবির্ভূত দুজন মহাত্মার নাম লেখো।

ঙ. দুজন ভারত পথিকের নাম লিখ।

৩. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও।

ক. নদী শুকিয়ে গেলে তার ফল কী হতে পারে?

খ. নদীমাতৃক জনচিত্তের বৈশিষ্ট্য/বিশেষত্ব কী?

উ. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। যে-চিত্তের আছে নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজর মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়— যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে। সেই জনচিত্তই নদীমাতৃক।

গ. প্রাচীন ভারত-চিত্তের বাণী কী ছিল?

ঘ. রামমোহনের আবির্ভাব লগ্নে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল?

ঙ. ভারতের সর্বপ্রথম সমস্যা বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চেয়েছিলেন?

চ. ভারতের সত্য পরিচয় কোথায় রয়েছে বলে লেখক মনে করেন?

উ. ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ।

এখানেই তার সত্য পরিচয়। উদার হৃদয় বিস্তার করে ভারত দেখিয়েছে সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান কারো স্থান সংকীর্ণতা নেই। এই উদার হৃদয় ভারতেরই হৃদয়। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে। স্বীকৃতি আছে।

ছ. মানুষের শ্রেষ্ঠতার হেতু কী?

উ. মানুষের আছে সমবায় ধর্ম। তা সত্য ধর্ম। এই সত্য ধর্মই তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।

৪. উত্তর লেখো।

ক. মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

খ. মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ হলে তার ফল কী হতে পারে?

গ. রামমোহন রায়কে রবীন্দ্রনাথ ভারতপথিক বলেছেন কেন?

ঘ. রামমোহনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করো।

৫. রচনাধর্মী উত্তর লেখো।

ক. রামমোহনের আবির্ভাব লগ্নে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল বর্ণনা করো।

খ. ভারতবর্ষের মহাজাতীয় চরিত্র গঠনে রামমোহনের অবদান কতখানি আলোচনা করো।

গ. 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' প্রবন্ধ অবলম্বনে ভারতের ঐক্যের সাধনার পরিচয় দাও।

৬. শুদ্ধ না অশুদ্ধ বলো—

ক. মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন কবীর।

খ. মেলবার সমস্যা সমাধান না-করলে আমাদের দুঃখের অন্ত নেই।

গ. দুর্গমকে সুগম করতে এসেছে ইংরাজ।

ঘ. মানব সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের বিচ্ছিন্নতা।

ঙ. মোহমুক্ত বুদ্ধির আশ্রয়ে আছে মানুষের মিলনতীর্থ।

৭. এই পাঠটি থেকে দশটি ক্রিয়াপদ বেছে নাও।

৮. পাঠ অবলম্বনে রামমোহনের অবদান বিষয়ক একটি প্রকল্প প্রস্তুত কর।

৯. বিশেষণ কাকে বলে? এই পাঠটি থেকে গোটা-দশেক বিশেষণ বাছাই করে লেখো।

১০. যে-কোনো দু-জন ভারতপথিকের জীবন অবলম্বনে দুটি প্রকল্প প্রস্তুত করো। ছবি ব্যবহার করতে হবে।

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৬৮—১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ আবশ্যক-কালে যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীর ভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকালতত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্ মার খাবি। এই বেলা ওঠ্।"

সে তাহাতে আরও একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল— সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে; কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে-সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে তাহা তাহার কিংবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—"মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।" গুঁড়ি এক পাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপর গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া, একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়?"

বালক ডাটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'ওই হোথা।" কিন্তু কোন দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,"কোথা?"

সে বলিল,"জানি নে।" বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিল।

অবিলম্বে বাঘা-বাগ্‌দি আসিয়া কহিল, "ফটিকদাদা, মা ডাকছে।"

ফটিক কহিল, 'যাব না।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস?'

ফটিক কহিল, "না, মারিনি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস?"

"কখ্‌খনো মারিনি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।"

মাখনকে প্রশ্ন করিতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ, মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যা কথা।"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়ে তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস।"

এমন সময় সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কী হচ্ছে তোমাদের।"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ যে দাদা? তুমি কবে এলে?" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল, দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল কোনো দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী-একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়-গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে, কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না। অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য-বশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়ে দিলে কীরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়-চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না-করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া ওঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না, এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়। অতএব, তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুরগ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামি যখন তার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন,"ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু পড়ো গে যাও"— তখন তার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর তাহার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী সেইসব দলবল, উপদ্রব স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশ তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা— কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা কেবল একটা না-দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা গোধূলি-সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা, মা' ক্রন্দন— সেই লজ্জিত শঙ্কিত

শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড় নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত; মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারাক্রান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলোর ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা মার কাছে কবে যাব?"

মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটি হোক।"

কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।"

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল— সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যাথা করিতে লাগিল এবং গা সির্ সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে, বুঝিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোটাকে যে কীরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক-হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখচক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ? দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের ইতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা আমার ছুটি হয়েছে কি?"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল; বলিল, "মা আমাকে মারিস নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ফটিক তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে—এ—এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাদেরই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে, এবং যে অকুল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময় ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনা, মানিক আমার!"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল,"আঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে, কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড় নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত; মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারাক্রান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলোর ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা মার কাছে কবে যাব?"

মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটি হোক।"

কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।"

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল— সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যাথা করিতে লাগিল এবং গা সির্ সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোটাকে যে কীরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক-হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখচক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ? দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের ইতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা আমার ছুটি হয়েছে কি?"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল; বলিল, "মা আমাকে মারিস নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ফটিক তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে—এ—এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাদেরই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে, এবং যে অকুল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময় ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনা, মানিক আমার!"

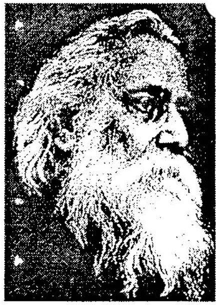
ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল,'আঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে, কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

লেখক পরিচিতি

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরে পরিবারে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা সারদা দেবী। লেখকের প্রতিভা কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গান ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই সমভাবে সুপরিস্ফুট। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। রবীন্দ্র প্রতিভা এক অপার বিস্ময়। কবি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। কবির প্রথম ছোট গল্প 'ভিখারিণী'। প্রথম উপন্যাস 'করুণা'। কবির রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'সোনার তরী', 'খেয়া', 'মানসী', 'নৈবেদ্য', 'কথা ও কাহিনি', 'পূরবী', 'গীতাঞ্জলি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ বিশ্বকবির দেহাবসান ঘটে।



কাবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচ্য 'ছুটি' গল্পটি লেখকের 'গল্পগুচ্ছ' প্রথম খণ্ড থেকে সংকলন করা হয়েছে।
লেখকের 'ছুটি' গল্পটি বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। সাহিত্যে বিশ্বজনীনতার যে আবেদন তা এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। গল্পটিতে কিশোর-মনস্তত্ত্ব বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে। কিশোর-বয়সের সমস্যা ও সংকটের এক অতি করুণ চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। সমবয়সী শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সত্য পরিচয় এই গল্পে লাভ করবে।

শব্দার্থ

আবশ্যক— দরকার, প্রয়োজন। প্রতীক্ষা— অপেক্ষা। ঔদাসীন্য— অমনোযোগ। আস্ফালন— দম্ভপ্রকাশ। ভূমিসাৎ-- ভূপতিত। সশব্দ— শব্দ-করে, শব্দ-সহ। ব্যামো— বেআরাম,অসুখ। নির্বোধ— বুদ্ধিহীন। উপলব্ধি— বোধ, বোধগম্যতা, অনুভূতি। প্রত্যাশা— আকাঙ্ক্ষা। অন্তপুরে— অন্দরমহলে। অনর্থক— অর্থহীন, অযথা। নিরীক্ষণ— দেখা, পর্যবেক্ষণ। প্রগলভা—অহংকারী, বাচালতা। আশঙ্কা—ভয়, ঔদার্য—উদারতা। অভিভূত—আপ্লুত। শশব্যস্ত— ত্রস্ত। দ্বিপ্রহর—দুপুর। অনুমোদন—সম্মতিদান। অহর্নিশ—দিনরাত।

টীকা লেখো নিজেরা : ফটিক, বিশ্বম্ভরবাবু, মাস্তুল, মাখনলাল।

পাঠের জ্ঞাতব্য বিষয়

ছুটি গল্পটির প্রধান চরিত্র ফটিক চক্রবর্তী। বালক ফটিকের বয়স মাত্র তেরো কি চৌদ্দ। গ্রামের মুক্ত পরিবেশে সে স্বাধীনভাবে বড় হয়েছিল। ফটিক বালকদের সর্দার। বালকরা সকলেই ফটিকের অনুসরণকারী। ফটিক সব কিছুতেই ওস্তাদ। সে নদীর তীরে তীরে ধাউস ঘুড়ি নিয়ে বোঁ বোঁ শব্দে উড়িয়েবেড়ায়। ফটিকের পড়াশুনায় খুব একট মন নেই। অকর্মণ্যভাবে ঘুরে বেড়িয়ে স্বাধীনভাবে দলবল নিয়ে খোলামাঠে খেলা করতে সে ভালবাসে। ফটিকের অত্যাচারিণী, অবিচারিণী মা অহর্নিশ তার চিত্তকে আকর্ষণ করে। একদা ফটিকের মামা বিশ্বম্ভর বাবু পিতৃহীন ফটিককে কলকাতায় পড়াশুনা করার জন্য নিয়ে যান। সেখানে ফটিক নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। কথায় কথায় মামির অনাদরে ওর অন্তর বিশেষভাবে আহত হয়। একদিন ফটিক পড়ার বই হারিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের গালমন্দ, এমনকী বেত্রাঘাত খেয়ে, বাড়ির সকলের কাছে অনাদর পেয়ে, মামার নিকট মায়ের কাছে গ্রামে যাওয়া বায়না ধরে। মামা বলেন পুজোর ছুটিতে সে মায়ের কাছে যাবে।

ফটিকের মুক্ত মন কলকাতার পরিবেশে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার সময় কাটছিল না। মাতৃভবন ছাড়া কোনো অপরিচিত স্থান ফটিকের পক্ষে নরক মনে হল। স্নেহশূন্য অবস্থা তাকে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল। বই হারিয়ে যাওয়ায় মামির তাচ্ছিল্য তার প্রাণে বাজল। একদিন স্কুল হতে ফিরলে, রাতে তার মাথা ব্যথা করে, গা সির সির করে ব্যামো বাঁধল। পরদিন প্রাতে ফটিককে দেখা গেল না। রাতের অবিশ্রান্ত মূষলধারে বৃষ্টিতে ভিজে রোগ হল। রোগের অন্তিম অবস্থায় তার মৃত্যু হল।

ক্রিয়াকলাপ

১. শুদ্ধ উত্তরটি খুঁজে বের করো।

(ক) **'ছুটি' গল্পের লেখক হলেন—**
(১) বনফুল (২) শরৎ চন্দ্র (৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪) সত্যজিৎ রায়।

(খ) **বালকদের সর্দার ছিল—**
(১) মাখলাল (২) ফটিক (৩) সুশান্ত (৪) রমেশ

(গ) **মাখনলাল ফটিক চক্রবর্তীর কে ছিল?**
(১) কাকা (২) বড়ভাই (৩) মেজভাই (৪) ছোটভাই

(ঘ) **ফটিকের মা, ফটিককে কোথায় চড় মেরেছিল?**
(১) পিঠে (২) কপালে (৩) গালে (৪) গণ্ডদেশে

(ঙ) **ফটিকের মামার নাম ছিল**
(১) রায়বাবু (২) কমলবাবু (৩) বিশ্বম্ভরবাবু (৪) আবীরবাবু।

২. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(১) নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড ——মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল।

(২) বিশেষতঃ ——বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।

(৩) মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুরগ্রহের মতো —— হইতেছে।

(৪) স্কুলে এত বড়ো নির্বোধ এবং ——বালক আর ছিল না।

৩. শুদ্ধ ও অশুদ্ধবাক্য খুঁজে বের করো।

(১) কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

(২) "একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত সাহসী হইয়া গিয়া কহিল, " বই হারিয়ে ফেলেছি।"

(৩) "এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল"।

(৪) ডাক্তারবাবু আনন্দমনে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

৪. ভাববিষয়ক অনুশীলন।

(ক) **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।**

(১) 'ছুটি' গল্পের লেখক কে?

(২) 'ছুটি গল্পের প্রধান চরিত্রটির নাম উল্লেখ করো।

(৩) 'ছুটি' গল্পটি লেখকের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

(৪) ফটিকের মামার নাম কী ছিল?

(৫) বালকদের সর্দার কে ছিল ?
(৬) ফটিকের মামা ফটিককে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন ?
(৭) ফটিকের বয়স কত ছিল ?
(৮) ফটিকের মামা ফটিককে কখন ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন ?
(৯) মাখনলাল এবং ফটিকের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল ?
(১০) ফটিক মাখনলালকে চড় মেরেছিল কেন ?
(১১) বিশ্বম্ভরবাবুর কয়টি সন্তান ছিল ?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।

১) "মামা, মার কাছে কবে যাব ?" উক্তিটি কার ? কখন, কাকে এই উক্তি করা হয়েছে ?
২) ফটিকের মামা কোথায় কী করতেন ?
৩) ফটিকের প্রতি ওর মামির ব্যবহার কীরূপ ছিল ?
৪) মা, ফটিককে কেন ওর মামার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, তা সংক্ষেপে লেখো।
৫) ফটিক মাখনলালকে সশব্দে চড় মেরেছিল কেন—বুঝিয়ে লেখো।
৬) নদীতীরে বালকদের খেলা বন্ধ হয়ে গেল কেন ?
৭) ফটিকের মামা এতদিন কোথায় ছিলেন ?
৮) কোন অবস্থায় ফটিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার কারণ লেখো।
৯) ফটিকের মাকে কেন বিশ্বম্ভরবাবু কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন ? মা এসে কী করলেন ?
১০) "ফটিক তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।" উক্তিটি কার ? কখন কেন এই উক্তির অবতারণা ?

গ. রচনাধর্মী উত্তর লেখো।

১। 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' উদ্ধৃত উক্তির যথার্থ বর্ণনা দাও।
২। ফটিকের মামির চরিত্র বর্ণনা করো।
৩। নদীতীরে বালকদের খেলার দৃশ্যটি বিস্তারিত বর্ণনা করো।
৪। বিশ্বম্ভরবাবু কে ? 'ছুটি' গল্পে তাঁর ভূমিকা আলোচনা করো।
৫। বালক ফটিকের চরিত্র বর্ণনা করো।
৬। গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখনলালের অবস্থা কী হইল ? পরে সে কী করিল—তার বর্ণনা দাও

ঘ. ব্যাখ্যা লেখো।

(১) "সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।"
(২) "বিশেষতঃ তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না"
(৩) "বেশ করেছ, আমি তোমাকে তো মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।"
(৪) "মা, আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"
(৫) মা, আমাকে মারিস নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।"

ঙ. প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করো।

(১) "আঁা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্।"

(২) "মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দূর গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে।"

(৩) "মামা, মার কাছে কবে যাবো?"

(৪) "মামা আমার ছুটি হয়েছে কী?"

(৫) "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

(৬) "ফটিক তোর, মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

চ. ভাষা বিষয়ক (ব্যাকরণ)

১) **পদান্তর করো —**

গম্ভীর—গাম্ভীর্য, বিস্ময়—বিস্মিত, উদাসীন—ঔদাসীন্য, আশঙ্কা—আশঙ্কিত।

নিজে করো —

কাতরতা, তাপ, দীন, অস্থির, ব্যাকুল, লজ্জা, চক্ষু, অন্তর, প্রবল, মন, শৈশব, সাহস।

২) **বাক্য রচনা করো —**

সির্‌সির্—ছেলেটির কাণ্ডটা দেখে আমার গা টা সির্‌সির্ করছে।

বিড়্‌বিড়্—জ্বরের ঘোরে বৃদ্ধাটি কী যেন বিড়্‌বিড়্ করছে।

খিট্‌খিট্—সব সময় ছেলেমেয়েদের প্রতি খিট্‌খিট্ করা ভালো নয়।

নিজে করো —

ফ্যাল ফ্যাল, থর্‌থর্, ঝুপ্‌ঝুপ্, বোঁ বোঁ, মনে মনে, ব্যথাব্যথা,

৩) **বিপরীত শব্দ লেখো —**

উদয়—অস্ত, কনিষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ, প্রকাণ্ড—ক্ষুদ্র, স্থির—চঞ্চল, পার্থিব—অপার্থিব।

নিজে করো —

মিথ্যা, সাধ্য, সশব্দ, সহ্য, সন্তুষ্ট, নিবৃত্ত, আরম্ভ, অনাদর, নিরাশা, উচ্চ।

৪) সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার সন্ধির সংজ্ঞা সহ পাঁচটি করে উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

বিশেষ যোগ্যতা —

(১) ছোট গল্প কাকে বলে?

(২) ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য কী?

(৩) রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঁচটি ছোট গল্পের নাম লেখো।

(৪) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। (১০০০ শব্দের মধ্যে)।

৯. উপর নীচে বর্ণমালা বসিয়ে শব্দ তৈরি করো। যেমন— মণিপুর। তারপর পাশাপাশি কী শব্দ তৈরি হল লেখো।

ম	ক	চ	র

জাগ্রত দেবতা

বনফুল
১৮৯৯—১৯৭৯

এক

মন্দিরটি যদিও জীর্ণ, আশেপাশে কচুবন, ঘেঁটুবন, দিনান্তে মহাদেবের মাথায় এক ফোঁটা জল পড়ে কিনা সন্দেহ, মহাদেব কিন্তু জাগ্রত। সনাতনপুরের মহাদেবের নাম শোনে নাই কে? জাগ্রত মহাদেবের নানা কাহিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে। বিপিন চৌধুরী এই মহাদেবের নিকট মানত করিয়াই মকদ্দমায় জিতিয়াছেন এবং অত বড় বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পালেদের বাড়ির ছেলেটা টাইফয়েডে তো প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিলই, এই মহাদেবের দ্বারে ধরনা দিয়াই তাহার মা তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। মুখুজ্জেদের যে আজকাল এত বাড়-বাড়ন্ত, তাহাও এই মহাদেবের কৃপায়। মহাদেবই স্বপ্নে দেখা দিয়া তাহাকে পাটের ব্যবসায়ে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মহাদেবের কাছে মানত করিয়া হরিহর ঘোষালও লটারিতে টাকা পাইয়াছেন। এরকম ছোটখাটো প্রমাণ ছাড়াও জীর্ণ মন্দিরবাসী মহাদেবের মহিমার আর একটি ভয়ানক প্রমাণ প্রতি বৎসর পাওয়া যায়। বৈশাখি পূর্ণিমার দিন এই মহাদেবকে কেন্দ্র করিয়া সনাতনপুরে প্রতি বৎসর প্রকাণ্ড উৎসব হয়। বহু নরনারী সেদিন শিবের মাথায় জল ঢালিয়ে থাকেন,—শিব শিব হর হর বোম্ বোম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। মুখুজ্জেরা এই উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি করাইয়া মহাদেবের স্বপ্ন-ঋণ শোধ করিবার প্রয়াস পান। চৌধুরীদের বাড়ি সেদিন আলোকমালায় সুসজ্জিত হয় এবং গ্রামের সকলে সেদিন সেখানে ভুরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়। আরও একটা ঘটনা সেদিন ঘটে, এইটাই মহাদেব মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত প্রমাণ—একজন লোক সেদিন পাগল হইয়া যায়। প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। পাগল ভোলানাথ প্রতি বৎসর একজনকে তাঁহার নিজের দলে টানিয়া লন।

দুই

সে বছরও বৈখাশি-পূর্ণিমা-উৎসব সুসম্পন্ন হইল। মুখুজ্জেদের বাড়িতে অভিনীত কর্ণার্জুন নাটকের অভিনয়-চমৎকারিত্বে সকলেই পুলকিত। চৌধুরী-বাড়িতে যদিও পায়েসটা একটু ধরিয়া গিয়াছিল, তথাপি সকলে পরিতৃপ্তি সহকারেই আহার করিয়াছিলেন। মেলাটাও বেশ জাঁকজমক সহকারেই বসিয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম আসে নাই। উৎসবের পরদিন এইসব লইয়া পালেদের চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় যাদব আসিয়া বলিল, ওহে শুনেছ, এ বছর কেউ পাগল হয়নি!

সমস্ত আলোচনা থামিয়া গেল। বলে কি! এ যে অসম্ভব ব্যাপার। হরেন বলিল, কেন, ওই গেঁজেল বিশেটা?

যাদব বলিল, দেখে এলাম, ঠিক আছে।

সকলেই আশা করেছিল, বিশেই এবার মহাদেবের নাম রক্ষা করিবে। সেও ঠিক আছে।

প্রবীণ নীলমণি এতক্ষণ নীরবে তামাক খাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এ হতে পারে না। ভাল করে খুঁজে দেখ কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে।

যাদব বলিল, এবার সকলের মাথা ঠিক আছে, কেউ বেঠিক হয়নি।

নীলমণি বলিলেন, হতে পারে না।

যাদব হাসিয়া বলিল, আমি বলছি, কেউ পাগল হয়নি এবার।

নীলমণি ধমকাইয়া উঠিলেন।

তুমি তো সেদিনকার ছোঁড়া হে, তোমার কথার আবার মূল্য কী? তোমার কথায় কি চিরকালের নিয়ম উল্টে যাবে? নিশ্চয়ই হয়েছে কেউ না কেউ পাগল, এখনও জানা যায়নি।

যাদব স্মিতমুখে নীরব হইয়া রহিল।

তিন

পরদিনও কোনো পাগলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনাতনপুরবাসীরা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। নিশ্চয়ই কোনো অমঙ্গল ঘটিবে। সত্যই এ বছর কেউ পাগল হয় নাই। নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। মহিলাগণ বলিলেন, এ রকমটা যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। বছরে মাত্র একদিন মহাদেবকে লইয়া ঘটা করিলে কি হইবে, বাকি তিন শো চৌশট্টি দিন তো শিবকে কেউ পৌঁছেও না, শিবের মাথায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ে না। মহাদেব বলিয়াই এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আর কত সহিবেন। মাতব্বর হালদার মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন যে ইহা আর কিছুই নয়, কলির প্রতাপ। কলি নিজের প্রতাপ দেখাইবেন না? সনাতনপুরের মহাদেব বলিয়াই এতকাল নিজ প্রতাপ বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, অন্য কোনো মহাদেব হইলে কোন কালে তলাইয়া যাইতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কয়েকটি মহাদেবের অধঃপতনের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। ধনী মুকুজ্জেরা দায়ী করিলেন পুরোহিতকে—ওই ব্যাটাই কিছু গোলমাল করিয়াছে। পুরোহিত চৌধুরীদের কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নামহীন একটা বিপদের ছায়া সনাতনপুরের সকলকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিল।

চার

দমিলেন না কেবল দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি।

তাঁহার বিশ্বাস কেহ না কেহ নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে, ইহারা তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সনাতনপুরের বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে? হইতেই পারে না।

দারুণ দ্বিপ্রহর। বৈশাখের দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত-চক্ষু স্ফীত-নাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছিলেন, পাগলটা কোথায় গেল। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

সনাতনপুরবাসীগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।

লেখক পরিচিতি



লেখক বনফুলের প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য জগতে লেখক 'বনফুল' ছদ্মনামে পরিচিত। লেখকের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জুলাই লেখকের জন্ম হয়। তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন চিকিৎসক হিসেবে। অনুগল্পের মধ্য দিয়ে লেখক বনফুলের সাহিত্য জগতে প্রবেশ ঘটেছিল। তাঁর অসংখ্য উপন্যাস, গল্প গ্রন্থ, কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। 'বৈতরণী তীরে', তৃণখণ্ড তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী গল্প সংকলন। স্থাবর, মৃগয়া, জঙ্গম ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। শ্রী মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

আলোচ্য 'জাগ্রত দেবতা' গল্পটি লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত।

'জাগ্রত দেবতা' পাঠটিতে কুসংস্কারবিরোধী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই পাঠটি সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

শব্দার্থ

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—বালক থেকে সকল বয়সের মানুষ। উত্তরাধিকারী— উত্তরকালের মালিকানা দাবিদার। পরিতৃপ্ত—সন্তোষ। পুলকিত—আনন্দিত। জাঁকজমক—ধুমধাম সহকারে। শঙ্কিত—ভীত। অনুমান—ধারণা।

টীকা

জাগ্রত দেবতা

যে দেবতার নিকট প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তিনিই জাগ্রত দেবতা। সনাতন পুরের বুড়ো শিবের মাহাত্ম্যে সকলের বিশ্বাস। মহাদেব জাগ্রত। সনাতনপুরের মহাদেবের কথা শুনেনি এমন হয়তো কেউ নেই। জাগ্রত মহাদেবের অনেক কাহিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই জানে। এ মহাদেবের একটা মহত্ত্ব হল যে প্রতি বৎসর বৈশাখি উৎসবের পর কোনো না কোনো একজন লোক পাগল হয়ে যায়।

নিজে লেখো

পাগল ভেলানাথ, বৈশাখি পূর্ণিমা উৎসব, চণ্ডীমণ্ডপ, নীলমণি।

পাঠের জ্ঞাতব্য বিষয়

ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত আছে। সমাজে দৃঢ় বিশ্বাসী কিছু কিছু মানুষের মনে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বাসা বাঁধতে দেখা যায়। তাঁরা কখনও যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। নিজের মনে যে বিশ্বাস জন্ম নেয় তাই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেন। এ ধরনের বিশ্বাস অনেক সময় সমাজের কত মানুষকে যে পাগল করে তোলে তার ইয়ত্তা নেই।

'জাগ্রত দেবতা' গল্পে অমনি এক অন্ধবিশ্বাসীর উন্মাদ প্রাপ্তির কাহিনি বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে।

সনাতন পুরের 'মহাদেব' জাগ্রত দেবতা বলে গ্রামের অনেকেরই বিশ্বাস। প্রতি বছর বৈশাখি পূর্ণিমার দিনটিতে দেবতাকে কেন্দ্র করে গ্রামে মহাধুমধামের সঙ্গে মহোৎসব হয়ে থাকে। দেবতা যে জাগ্রত তার জ্বলন্ত প্রমাণও পাওয়া যায় সে দিনই। প্রতিবছর একজন লোক বৈশাখি পূর্ণিমায় পাগল হয়ে যায়। সে বছরও মহাসমারোহে বৈশাখি পূর্ণিমার উৎসব

পালিত হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন কেউ পাগল হয়েছে বলে জানা যায়নি। অন্ধবিশ্বাসীর মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে কি দেবপূজায় কোনো বিঘ্ন ঘটেছে? পূজার প্রত্যক্ষ ফল না পাওয়ায় মনে হল সনাতনপুরের বুড়ো শিব (মহাদেব) প্রজাদের উপর রুষ্ট হয়ে কিছু অমঙ্গল অভিশাপ দিয়েছেন। এই আশঙ্কা দৃঢ় বিশ্বাসী নীলমণিকে পেয়ে বসে। তিনি বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রোদে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার রক্তচক্ষু, স্ফীতনাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করছেন পাগলটা কোথায়; তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। নীলমণির অবস্থা দেখে সনাতনপুরবাসী সকলে আশ্বস্ত হলেন যে জাগ্রত দেবতার মহিমা জাগ্রত আছে।

ক্রিয়াকলাপ।

১. শুদ্ধ উত্তরটি নির্দেশ করো।

১। 'জাগ্রত দেবতা' পাঠটির লেখকের নাম—

(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) বনফুল (গ) সত্যজিৎ রায় (ঘ) বিবেকানন্দ

২। গ্রামের সকলকে কে খবর দিল যে এ বছর কেউ পাগল হয়নি?

(ক) বিপিন (খ) যাদব (গ) হরিহর (ঘ) হরেন

৩। বৈশাখি পূর্ণিমা উৎসবের দিন সনাতনপুরে প্রতি বছর কতজন লোক পাগল হয়?

(ক) তিনজন (খ) চারজন (গ) একজন (ঘ) দু-জন

৪। কোন লেখকের ছদ্মনাম বনফুল?

(ক) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) বঙ্কিমচন্দ্র (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র।

২. শুদ্ধ উত্তরটি লেখো।

(ক) চৌধুরীদের যে আজকাল এত বাড়-বাড়ন্ত তা এই মহাদেবের কৃপায়

(খ) প্রতিবছর সনাতনপুরে প্রকাণ্ড উৎসব হয়।

(গ) সনাতনপুরের মহাদেবের নাম কেউ শুনেনি।

(ঘ) মহাদেবের নিকট মানত করেই বিপিনবাবুরা মকদ্দমায় জিতেছেন।

৩. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

১। যাদব—নীরব হইয়া রহিল।

২। হরেন বলিল, 'কেন, ওই গেঁজেল—?

৩। পাগল ভোলনাথ প্রতি বৎসর একজনকে তাঁহার—টানিয়া লন।

৪। ধনী মুখুজ্জেরা দায়ী করিলেন—।

৪. **প্রশ্নাবলি (ভাব বিষয়ক)।**

(ক) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।

১। 'জাগ্রত দেবতা' গল্পের লেখক কে?

২। মুখুজ্জেদের এত বাড়-বাড়ন্তের কারণ কী?

৩। সনাতনপুরে কাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর প্রকাণ্ড উৎসব হয়?

৪। মহাদেবের মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত প্রমাণ কী?

৫। মুখুজ্জেদের বাড়িতে কী নাটক অভিনীত হয়েছিল?

অসমের বাদ্যযন্ত্র

প্রদীপ চলিহা

১৯১৮—২০০৪

প্রাচীন ভারতে সংগীতের বাদ্যযন্ত্রগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে— অবনদ্ধ, তত, সুষির এবং ঘন।

অবনদ্ধ বা লয়যন্ত্র : জন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরি ফোঁপলা কাঠ, মাটি বা ধাতুর সামগ্রীতে নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। যেমন— ঢোল, খোল, তবলা।

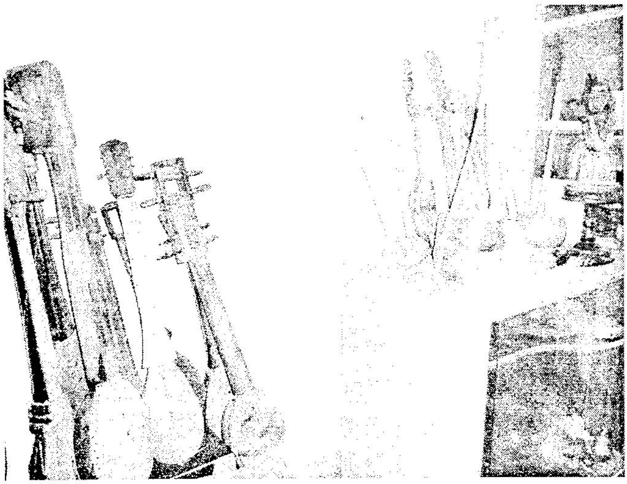
তত বা তারের সুরযন্ত্র : দিঘল কাঠ বা বাঁশে তার বা সুতোর গুনা টেনে নির্মিত সুরযন্ত্র। যেমন— বীণা, ডুগডুগি।

সুষির বা বাতাসের সাহায্যে সৃষ্ট সুরযন্ত্র : ফাঁপা বাঁশ, কাঠ বা ধাতুর চোঙায় বাতাসের সহযোগে স্বর সৃষ্টিকারী সুরযন্ত্র। যেমন— বাঁশি, ভেঁপু।

ঘন বা দুটি বস্তুর সংঘাতে বাজানো তালযন্ত্র : দুটি ধাতু, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি বস্তুর সংঘাতে বাজানো তালযন্ত্র, যেমন— তাল, করতাল, মন্দিরা।

পাশ্চাত্য দেশগুলোতেও বাদ্যযন্ত্রকে এভাবেই ভাগ করা হয়েছে; যেমন— অবনদ্ধ (membranophone); তত (chordophone); সুষির, ঘন (idiophone) ইত্যাদি।

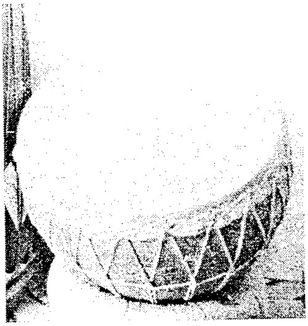
এইসব ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বহু আখ্যান প্রচলিত আছে; যেমন— মেঘগর্জনের অনুকরণে ঢোল-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, ঝরনার কুলুকুলু ধ্বনির অনুকরণে তারের সুরযন্ত্র, বাঁশবনে বায়ু প্রবাহিত হলে যে-শব্দ ওঠে তার অনুকরণে বাঁশি এবং পাথরে পাথরে ঘর্ষণ লেগে যে শব্দ নির্গত হয় তার অনুকরণে সৃষ্টি হল তাল-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এর অন্য আখ্যানও পাওয়া যায়। ধনঞ্জয়ের সংগীত শাস্ত্র দশরূপক-এর প্রথম শ্লোকটিও এমন দুটি অর্থে রচিত রয়েছে।



কাঠ ও বাঁশের তৈরি তত (তারের) বাদ্যযন্ত্র

অসমে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে জনসাধারণ্যে বেশকিছু স্থানীয় বা লোকায়ত বা 'দেশী' বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত

ছিল। সেইসবেরেই কিছু কিছু আদিম রূপ এখনও অসমের জনমানসে প্রচলিত আছে। বাকি অনেকগুলোরই নাম বদলে গেছে এবং অনেকের বিলুপ্তি ঘটেছে। সাধারণ ঢোল, বাঁশের টকা, বাঁশের ঢোপ চুঙা, বাঁশের নল বাশ বাঁশী, মোষের শিঙের পেপা (মোষের শিঙের শিঙা), শিঙা, গগনা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের রূপ মনে হচ্ছে আদিকাল থেকে একই আছে।



ডবা

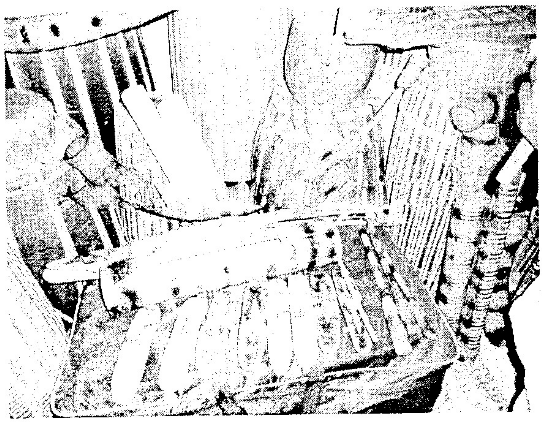
অসমের বাদ্যযন্ত্রগুলোর কিছুসংখ্যক হচ্ছে 'দেশী' বা লোকসংগীতের বাদ্যযন্ত্র এবং বাকি কিছু আছে 'মার্গ' বা শাস্ত্রীয় সংগীতের বাদ্যযন্ত্র। কিছু কিছু আবার পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অসমের 'দেশী' বা লোকসংগীতের অতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির ঢোল, মাদল, ডম্বরু (পূর্ণধরীয়া সম্প্রদায় কর্তৃক উপাসনায় বাজানো হয়) ডগর, ধেমেসি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাঁশ দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র— টকা, গগনা, রেপনি (নিম্ন অসমে যাকে বলে বেণু), বাদুংদোপা (রাভাদের) নলবাঁশের কারা (রাভা), বাঁশি, লাখর বাঁশি (রাভা), চিফুং (বোড়ো), কারাংডোবাং (ডিমাসা), লাউয়ের খোলায় তৈরি লাউটোকারি (একতারা) এবং কাঠ, মাটি, শিং প্রভৃতি দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র, মোষের শিঙের পেপা (ভেঁপু, শিঙা), কাঠের পেপা (ডিমাসা ও কার্বিদের) মাটির তৈরি সুতুলি (ভেঁপু-জাতীয় বাদ্য বিশেষ) ইত্যাদি প্রধান। এই বাদ্যযন্ত্রগুলো আদিম রূপে আজও অসমের লোকসংগীতে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

এর পরবর্তীকালে দেশী বাদ্যযন্ত্রসমূহ ডবা, শঙ্খ, কাঁসা, তাল, সেরেন্ডা (সারিন্দা) বীণ, দোতারা, জম্বুং মহরি ইত্যাদি লোকসংগীত ও ধর্মসংগীতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

অসমে আর্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের পরই 'মার্গ' বা শাস্ত্রীয় সংগীত ও তার সঙ্গে মার্গীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হয়। মার্গ সংগীতের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে— শ্রুতি, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বরকাঁহ (করতাল) ঘণ্টা, নেপুর (নূপুর), পটহ, ভেরি, গোমুখ, রামশিঙা, রুদ্রবীণা, কাহাল (কালি) ইত্যাদি প্রধান।

অসমে রচিত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এইসব বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়।



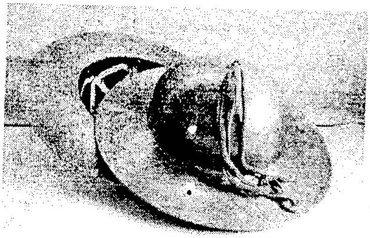
অসমের বিচিত্র সব বাদ্যযন্ত্র

কামরূপের নরপতিদের তাম্রফলকে উল্লেখিত নট-নটীরা মন্দিরের নৃত্যগীতে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছেন তাদের অনেকটাই বোধকরি মার্গ সংগীতের বাদ্যযন্ত্রই ছিল। অসমে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে সামবেদ-এর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র 'শ্রুতিধর' বা তম্বুরাজাতীয় তার-যন্ত্র নিশ্চয় প্রচলিত হয়েছিল। আর্য সংগীত অর্থাৎ মার্গ সংগীতে— তাল, মৃদঙ্গ আর শ্রুতিধরের বিশেষ প্রয়োজন।

অসমের সংস্কৃত সাহিত্যে লভ্য বাদ্যযন্ত্রসমূহের মধ্যে বীণা, বেণু, পটহ, তূর্য, শঙ্খ, ভেরি, মৃদঙ্গ ইত্যাদির সমধিক

উল্লেখ লক্ষ করি। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রেও এই একই বাদ্যযন্ত্রের নাম প্রসঙ্গক্রমে নানা স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

চর্যাপদেও পূর্ব-ভারত তথা কামরূপ রাজ্যের বাদ্যযন্ত্রের নামের উল্লেখ আছে। যেমন— ডমরু (ডম্বরু) নেউর (নূপুর) ঘণ্টা বা টিলিঙা, লাওটোকারি, হেরুকবীণা, মাদল, দুন্দুভি, পটহ ইত্যাদি।



ভোরতাল

প্রাক্-শংকরদেব যুগের প্রখ্যাত কবি মাধব কন্দলির রামায়ণে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্রের নাম— মর্দল, খুমুসি, ভেমুসি, ডগর, করতাল, কাহাল, বীরঢাক, ঢোল, তবলা, দণ্ডি, ভেমস, খোমস (খুমুসি), ঝাঝর, রেমসি, রামতাল, কেন্দেরা, (ক্যানেস্তারা), টোকারি, রুদ্র বিপঞ্চী (রুদ্রবীণা) দোতারা, বীণা, বাঁহি (বাঁশি), দোশরি, মোহরি, জিজিরি, কাহালি, (কালি), শিঙা, ভেরি ইত্যাদি।

প্রাক্-শংকরদেব যুগেরই আরেকজন বিখ্যাত কবি হরিহর বিপ্র। তাঁর রচনায়ও একই রকমের বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। যেমন— ঢাক, ঢোল, ভেরি, টুপেসি, খুমুসি, ডগর, টোকারি, করতাল, ডম্বরু, বীণা, ঝাঝর ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কিছু বাদ্যযন্ত্রের নামের উচ্চারণ ধ্বনি প্রায় একই। কিন্তু লিখিত বানান স্বতন্ত্র, ফলে এইসব বাদ্যযন্ত্র একই না পৃথক কোনো বাদ্যযন্ত্র সে-কথা বুঝে ওঠা কঠিন। যেমন— ক্ষেমস, খুমুছি, ভেমস-ভেমসি, ঝাঁঝর-জিজিরি ইত্যাদি। সেই যুগের বা বৈষ্ণবযুগের পুথিসমূহে প্রায়ই এই সব বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

এর পরবর্তী যুগের সূর্যখড়ি দৈবজ্ঞ রচিত 'দরং রাজবংশাবলি'-তে মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজ্যাভিষেক উৎসবে বাদিত বাদ্যযন্ত্রের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আমরা পাই। কিন্তু এই তালকিায় উল্লেখিত সকল বাদ্যযন্ত্র সেই সময়ে প্রকৃতার্থে প্রচলিত ছিল, না কবি তাঁর কাব্যের স্বার্থে তাঁর স্মৃতি থেকে নামগুলো লিখে গেছেন, সে-কথা বোঝা মুশকিল। 'দরং রাজবংশাবলি'র বাদ্যযন্ত্রসমূহের নাম— শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, দুন্দুভি, ঢাক, ঢোল, ডগর, নাকাড়া, রামবেনা, কবিলাস, খঞ্জরিকা (খঞ্জরি), মোহরি (বড় পেঁপা), দোতারা, রবাব (মার্গ সংগীতের পারসিক বাদ্যযন্ত্র), সারিন্দা, (সেরেন্ডা), বাঁশি, ঝিলি, ঝিমিরিকা, রুদ্রক টোকারি (রুদ্রবীণা), তুরি (তূর্য), মৃদঙ্গ, মন্দিরা, (খুটিতাল), খোল, ধোমসি, (ধেমেসি, নাকাড়ার চেয়ে বড় বাদ্যযন্ত্র), গোগোনা (গগনা), মুরুলি, উপাঙ্গ (বাঁশের করতাল), বরকাংস (বৃহৎ কাঁসা) মচুওই, জেম্প (জগজম্প), জয়কালি (রণভেরি), ভেরি, রামশিঙা, রামতাল (রেপনি), ঝেঙুরা, গোমুখ, (শঙ্খ বিশেষ), বীরকালি (রণভেরি), সিংহবান, তবল, দোসরি, ঢোলক ইত্যাদি। প্রায় এই একই সময়ে দরঙে ধেপা ঢোলের প্রচলন হয়। এটি দীর্ঘাকৃতির কাঠের ঢোল। তালির স্বর টিঙটিঙে এবং দবনির (খালি) স্বর ধেপা। তাই একে ঢেপাঢোল বলা হয়। দরঙের 'দেওধনি' নৃত্যের জয়ঢোলের নামও উল্লেখযোগ্য।



বিহু নৃত্যে ব্যবহৃত পেঁপা

অসমের বাদ্যযন্ত্রের কিছু কথা অসম বুরঞ্জিতেও পাওয়া যায়। মহারাজ চুহুংমুং চুটিয়া রাজ্য জয় করে যে-সকল সামগ্রী লুটে এনেছেন তার মধ্যে কয়কেপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের নামও পাওয়া যায়। বরকাঁহ, কালি, ডবা ইত্যাদি। বুরঞ্জির বিবরণ অনুযায়ী চুটিয়া রাজ্য থেকে এনে মহারাজ সেসব বাদ্যযন্ত্র আহোম রাজ্যে প্রচলন করেন।

শংকরদেব-যুগের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্রধান হল— খোল, মৃদং (মৃদঙ্গ), ভোটতাল (ভোরতাল), পাতিতাল, খুটিতাল, খমক। সেই যুগে তারযন্ত্রের মধ্যে অসমে সারেংদার (সারেঙ্গি)-এর প্রচলন ছিল। চরিত-গ্রন্থে আছে, শ্রীশংকরদেবের ভাইজি, ভাই রামরায়ের কন্যা কমলপ্রিয়া সারেঙ্গি বাজিয়ে সুললিত কণ্ঠে বরগীত পরিবেশন করেন। সেই সংগীতে আপ্লুত হয়ে চিলারায় দেওয়ান তাঁকে বিবাহ করেন। মহাপুরুষ মাধবদেবও সারেঙ্গি বাজাতেন বলে প্রবাদ প্রচলিত আছে। চরিতপুথিতে ভোটতালের শৈলীতে রহার কাঁসারিকে দিয়ে ছোট আকারের পাতিতাল গড়িয়ে নেবার উল্লেখ পাওয়া যায়। শংকরদেবের যুগে নতুন রূপে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র হল খোল। সেই সময় প্রতিবেশী রাজ্য বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের বৈষ্ণবগণও খোল ব্যবহার করতেন। প্রাচীন মৃদঙ্গের চেয়েও খোলের স্বর কোমল এবং বরগীত ইত্যাদি সংগীতের বাদনে উপযুক্ত; তা ছাড়া মৃদঙ্গের চেয়ে সুলভ ও সহজলভ্য। ফলে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল খোল।



সুতুলি

আহোম ও কোচ রাজাদের আমলে মোগল রাজ্য থেকে আগত নাকাড়া, তবল, ঢুলকি, পাখোয়াজ, রবাব প্রভৃতি বিদেশী বাদ্যযন্ত্র অসমে প্রচলিত হয়। পাখোয়াজ, ঢোলক ইত্যাদি প্রথমে আহোম রাজসভায় সমাদৃত হয়। পরে রাজ অনুগ্রহ প্রাপ্ত বিখ্যাত সত্রগুলোতে স্থান লাভ করে। সেই সময় থেকে চারটি সত্রে 'পাখৌজিয়া', এবং 'হাজোওলিয়া' গায়ন-বায়নের প্রচলন হয়। পাখৌজিয়া নবধারার এবং হাজৌলিয়া প্রাচীনধারার বাজনা। এখনও শ্রীশ্রী আউনিআটি সত্রে ঢোলোকর ব্যবহার প্রচলিত আছে।

কোচ রাজাদের অনুগ্রহে নিম্ন অসমের কোচ রাজ্যে মোগলদের 'শাহ নাই' বা 'শানাই' (শাহ্ = রাজা, নাই = বাঁশি অর্থাৎ বাঁশির রাজা) সমাদর লাভ করে। সেকালে বঙ্গদেশীয় ঢোল 'ঢাক'-ও কোচরাজ্যে প্রচলিত হতে শুরু করে। মোগলদের অনুকরণে বিজনি প্রভৃতি কোচ রাজাদের হাউলির প্রাঙ্গণে 'নহবৎখানা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিনরাত্রির প্রহর অনুসারে এই নহবৎখানায় সানাই নাকাড়া ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে প্রহর-উপযোগী মার্গীয় রাগের যন্ত্রসংগীত বাদনের চল হয়েছিল। সেই নিয়ম এই তো সেদিন পর্যন্ত গোয়ালপাড়া জেলার রাজা জমিদার প্রভৃতির গৃহে অনুসৃত হচ্ছিল। আজও পশ্চিম গোয়ালপাড়ায় সানাই এবং ঢাক খুবই জনপ্রিয়।

ব্রিটিশ যুগের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় মার্গ ও লঘু সংগীত অসমে সমাদর লাভ করে। ফলে উত্তর ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র— সেতার, এস্‌রাজ, দিলরুবা, সরোদ, তাউস, তানপুরা, তবলা, সুরবাহার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র অসমে প্রচলিত হয়।

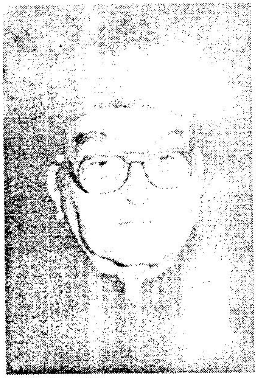
ব্রিটিশ যুগেই বিদেশি বাদ্য বেহালাও অসমে প্রবেশ করে এবং স্বদেশী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে একাসনে স্থান লাভ করে। বেহালা ছিল বিশেষ করে নর্তকী ও নটিনীদের নৃত্যের জনপ্রিয় বাদ্য।

আহোম যুগে কামরূপের ঢুলিয়ারা (ঢোল বাদকগণ) নানাপ্রকার কসরৎ, চিত-ঝাঁপ দিয়ে ঢোল বাজানোর এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। তাদের সুবিধার জন্য ঢোলের আকৃতিও কিঞ্চিৎ ভিন্ন আদল পায়। পরিতাপের কথা এই ঢুলিয়া কসরৎ বর্তমানে অবলুপ্ত হতে চলেছে।

বর্তমান যুগে বিদেশী বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়ম সংগীত-শিক্ষার্থীর প্রিয়তর বাদ্যযন্ত্র। গাঁ-গেরামে ব্যান্ডপার্টি, বেগপাইপ ইত্যাদির সম-লয় বাদন (কনসার্ট) খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন অসমে উত্তর-ভারতের প্রায় সকল বাদ্যযন্ত্রেরই প্রচলন হয়েছে। তদুপরি পাশ্চাত্য সংগীতের বহু বাদ্যযন্ত্র অসমিয়া যুকদের প্রিয়। এর মধ্যে বোধকরি গিটার-ই সর্বাধিক সমাদৃত।

[ভাষাবদল ঃ মিহির মজুমদার]

লেখক পরিচয়



প্রদীপ চলিহার জন্ম ১৯১৮ সালে। ইনি সত্রীয়া সংস্কৃতির সাধক। অসমের নানা সত্রে তিনি সত্রীয়া নৃত্যের অনুশীলন তথা শিক্ষা করেন। এই নৃত্যশিক্ষায় তিনি প্রধানত উমানাথ গায়ন, জীবেশ্বর গোস্বামী, মিত্রদেব মহন্ত, ইন্দ্রেশ্বর বরঠাকুর প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। প্রদীপ চলিহা এককালে সত্রীয়া নৃত্যের খ্যাতনামা শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সত্রের নৃত্য-কলা-ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন নিরলস গবেষক। তাঁর প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল 'ব্যাহ ওজাপালি' (অর্ধ-নাটকীয় পরিবেশ্য কলা) 'অঙ্কীয়া ভাওনা'তেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ' সংস্কৃত ভাষা থেকে অসমিয়ায় অনুবাদ করেন। নৃত্যশিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি গোলাঘাটে 'অজন্তা কলামণ্ডল' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি প্রধান করে। এবং ১৯৯৮ সালে তিনি লাভ করেন ভারতের সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার। ২০০৪ সালে এই কৃতবিদ্য শিল্পীর মৃত্যু হয়।

পাঠ-প্রসঙ্গ

অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতে গীতবাদ্যের প্রচলন ছিল। অসমও এ ক্ষেত্রে যে পিছিয়ে ছিল না, তার প্রমাণ এই প্রবন্ধ। প্রাচীন অসমের লোকজীবনের বিভিন্ন স্তরে, রাজদরবার থেকে আম জনতা তথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীতবাদ্যের প্রকৃতি কেমন ছিল তার সতথ্য বিবরণ আমরা এখানে পাই।

'অসমের বাদ্যযন্ত্র' পাঠটিতে অসমের সংস্কতির একটা দিক পরিস্ফুট। সংগীতচর্চা এবং তার অনুষঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সুদূর অতীতকাল থেকে আজ অবধি যে পথ পরিক্রমা করে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে আছে। বৃহত্তর অসমের জনমানসের পরোক্ষ একটা প্রতিচ্ছবিও লেখক তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের অন্তরে সংস্কৃতি মনস্কতার বীজ রোপন করা এবং স্বদেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই পাঠের গুরুত্ব রয়েছে।

শব্দার্থ

অবনদ্ধ — যে বাদ্যযন্ত্রে পশুচর্ম ব্যবহৃত হয়।

তত — তারের সুরযন্ত্র।

সুষির — বাতাসের সাহায্যে সৃষ্ট সুরযন্ত্র।

চামড়া— ছাল, বাকল।

ফোঁপলা— ফাঁপা।

নির্মিত— তৈরি।

দিঘল— দীর্ঘ, লম্বা।

সংঘাত— মুখোমুখি আঘাত।

সুরযন্ত্র— বাজনা, যে যন্ত্রে সুর সৃষ্টি হয়।

মেঘগর্জন— মেঘের ডাক।

প্রচলিত— চল আছে এমন।

নির্গত— বের হওয়া।

আখ্যান— কথা, গল্প।

লোকায়ত— লোক সমাজে প্রচলিত।

লোকসংগীত— লোকগান, গ্রাম্য লোকের নিজস্ব সংগীত।

রাভা— অসমের এক উপজাতি বা সম্প্রদায়।

বোড়ো— অসমের এক উপজাতি বা সম্প্রদায়।

ধর্মীয় সংগীত— ঈশ্বর উপাসনার গান।

শৈলী— নির্মাণ কলা বা পদ্ধতি।

সূত্রপাত— সূচনা, আরম্ভ, প্রারম্ভ।

নটিনী— নৃত্য পটিয়সী রমণী।

টোকারি — আঙুলে বাজানো এক-তার (গুনা) সংযুক্ত বাদ্য বিশেষ। একতারা-সদৃশ বাদ্য।

পেঁপা — মুখে ফুঁ-দিয়ে বাজানো একপ্রকার ভেঁপু তথা শিঙা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। অসমিয়া সংস্কৃতির অন্যতম উপকরণ 'পেঁপা'।

কালি — একপ্রকার ছোট বাঁশি।

টকা — বাঁশের মাথা দু-ফালা করে তৈরি বাদ্য বিশেষ।

ঢোপ-চুঙা — একপ্রকার বাদ্য।

রেপনি — বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। যেমন— রেপনি তাল— বাঁশের তৈরি বাদ্য। তারের বাদ্যযন্ত্রে ঘষবার নিমিত্ত তৈরি ধনুক-সদৃশ সরঞ্জামকেও 'রেপনি' বলা হয়। যেমন— বেহালায় ব্যবহৃত হয়।

গগনা— বাঁশ-নির্মিত শিঙা-বাদ্য। অসমিয়া সংস্কৃতির অন্যতম উপকরণ এই 'গগনা'।

ডগর— ঢাক-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। বাংলায় দগড়।

ধেমেসি— ঢোল-জাতীয় বাদ্য বিশেষ।

বাদুংদোপা— রাভা উপজাতি সমাজে প্রচলিত বাঁশের তৈরি প্রসিদ্ধ বাদ্য।

কারা— রাভাদের বাদ্য বিশেষ। এটি বাঁশের তৈরি বাদ্য।

লাখর-বাঁহি— বাঁশের তৈরি রাভাদের বাঁশি বিশেষ।

সিফুং— বোড়ো উপজাতিদের অন্যতম প্রসিদ্ধ বাঁশি বিশেষ।

কারাংডোবাং— ডিমাসা উপজাতি সমাজের অন্যতম বাদ্য। এটি বাঁশের তৈরি।

ডবা— এটি নাকাড়া-জাতীয় বাদ্য বিশেষ।

জয়্রং— দেশী বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

মহরি— সম্ভবত মাহুরি। ফুঁ-দিয়ে বাজানো বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

বরকাঁহ— কাঁসার বৃহৎ আকৃতির বাদ্য।

পটহ— জয়ঢাক। রণবাদ্য।

গোমুখ— শঙ্খ-জাতীয় বাদ্য।

কাহাল (কালি)— শব্দটি সংস্কৃত কাহল থেকে আগত। ফুঁ-দিয়ে বাজানো 'পেঁপা' অর্থাৎ শিঙা-জাতীয় বাদ্য।

তূর্য— ভারতীয় প্রাচীন রণবাদ্য। রণশিঙা।

মর্দল— মর্দ্দল। অর্থ— ঢোল।

খুমুসি— নাকাড়া-সদৃশ একমুখো বাদ্য বিশেষ।

ঝাঝর— সংস্কৃত শব্দ 'ঝর্ঝর' থেকে ঝাঝর শব্দটি এসেছে। কাঁস-নির্মিত তালবাদ্য; কাঁসর। আবার 'ঝঝর' হল বাঁশ-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। বাংলায় ঝাঁঝর।

রামতাল— রাম = রামচন্দ্র + তাল। এটি চার টুকরো বাঁশের করতাল বিশেষ। বিবাগী তা বাজিয়ে রাম-নাম গায়।

মোহরী— সম্ভবত 'মহরি' বা 'মাহুরি'। ফুঁ-দিয়ে বাজানো বাদ্য বিশেষ।

কবিলাস— বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

ঝিলি— একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। সম্ভবত 'ঝল্লক' থেকে আগত।

তুরি— রণশিঙা।

ধোমসি— সম্ভবত 'ধেমেসি' জাতীয় বাদ্য। এটি প্রাচীন অসমের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। চা-বাগানের শ্রমিকদের বাদ্যযন্ত্র যেমন— ধুমসা।

উপাঙ্গ— একপ্রকার শিঙা-বাদ্য।

ডবা— দামামা।

জয়কালী— রণভেরি।

ভেরি— রণক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাদ্য বিশেষ।

বীরকালি— ফুঁ-দিয়ে বাজানো অসমের প্রসিদ্ধ বাদ্য বিশেষ।

ধেপা ঢোল— দরঙে প্রচলিত এক প্রকার ঢ্যাপসা ঢোল বিশেষ; ঢেপ-ঢেপ শব্দে বাজে এই ঢোল। কারণ ঢোলের চামড়ায় ফুটো থাকে।

ভোট তাল (ভোর তাল)— বৃহৎ আকৃতির করতাল। ভোট শব্দ দেশ-বাচক। ভোট-প্রদেশ থেকে আগত তালবাদ্য।

তালি— কোচ-রাজবংশীদের করতাল বাদ্য 'তালিম্'। আর তালি হল খোলের ডান হাতের বাজানো অংশ।

পাতিতাল— ভোটতালের বিপরীত। অর্থাৎ সাধারণ করতাল বিশেষ।

খমক— এক-প্রকার বাদ্য।

নেগেরা— নাকাড়া।

টীকা

ধনঞ্জয়

খ্রিস্টীয় দশম শতকের লেখক। নাট্যশাস্ত্র ও অলংকার বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দশরূপক'। এই 'দশরূপক' গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেছেন ধনিক। এই টীকা ধনিক তাঁর ''অবলোক'' গ্রন্থে সংযোগ করেছেন। ধনিক রসশাস্ত্রী ধনঞ্জয়ের সমসাময়িক ছিলেন।

দশরূপক

দশরূপক একটি সংস্কৃত গ্রন্থ। এতে রস ও তৎ-সম্পর্কিত বিষয় ছাড়াও নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক একটি অধ্যায় আছে। এই গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেছেন ধনিক তাঁর 'অবলোক' গ্রন্থে।

লোকসংগীত

লোকসংগীত অর্থে এক কথায় লোকজীবনের গানকে বোঝায়। ইংলিশ ভাষায় ফোক্ সঙ্-এর বাংলা হল লোকসংগীত। যদিও ব্যাপক অর্থে লোকসংগীতের আলাদা তাৎপর্য আছে। লোকসংগীতের উৎস গ্রামের জল মাটি হাওয়া। তাই এর মধ্যে থাকে পরম্পরাগত শব্দ ও সুরের ঐতিহ্য— যাকে ভিত্তি করে গ্রামীণ সংস্কৃতি ধারাবাহিকতার পথ প্রশস্ত করে। প্রয়োজনবোধে এর উদ্ভব। এবং নানা শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে সমাজের গভীরে শিকড় বিস্তার করে। অসমের লোকসংগীতের মধ্যে কামরূপীয়া গীত, গোয়ালপাড়িয়া গীত উল্লেখযোগ্য। আর বাংলার লোকসংগীত

যেমন— ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বয়াতির গান ইত্যাদি আরও অনেক গান।

চুটিয়া রাজ্য

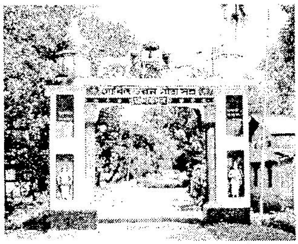
চুটিয়া রাজ্যের কথা পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এই অতি প্রাচীন রাজ্যটি ভারতের পূর্বোত্তর সীমা বর্তমানের শদিয়া অঞ্চল। চুটিয়া জাতি অসমের আদিমতম আধিবাসীদের অন্যতম। এরা পুরাণ-প্রসিদ্ধ বিদর্ভ বা কুণ্ডিল রাজা ভীষ্মকের বংশধর বলে দাবি করেন।

১২২৮ খ্রিস্টাব্দে আহোম রাজা চুকাফা অসমে রাজ্য স্থাপন করতে এসে চুটিয়াদের মধ্যে লিখিত ভাষার প্রচলন প্রত্যক্ষ করেন।

বেশ কিছু আহোম বুরঞ্জি থেকে জানা যায়, প্রাচীন কালে দিহিং নদীর পারে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। ৪২০-৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে খুনলুং-খুনলায় রাজ্য শাসন করেছিলেন। কথিত আছে খুন্‌লা নামক এক রাজকুমার মুংকুলা [মুং = দেশ, কুলা = হিন্দু] অর্থাৎ হিন্দুদেশের অধিপতি ছিলেন।

এই প্রাচীন চুটিয়া রাজ্যের শেষ রাজা ছিলেন লেক্‌রয়। তাঁর শাসন কাল ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

সত্র



'সত্র' শব্দটি সংস্কৃত 'সত্র' শব্দের অসমিয়া রূপান্তর। সংস্কৃতে 'সত্র' কথার মানে দীর্ঘকালীন যজ্ঞ। কিন্তু অসমিয়া সমাজে (বৈষ্ণব) ধর্মাচরণের নিমিত্ত ভক্তদের বাসোপযোগী ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থাৎ 'সত্র' হল বৈষ্ণব ভক্তি চর্চার কেন্দ্র। 'সত্র' শব্দটি আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দী (১২০১-১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে প্রচলিত আছে।

অসমের 'সত্র' সমূহের তিনটি পক্ষ থাকে। তাঁরা সত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকেন। এঁরা হলেন—

১. অধিকার বা বুড়ো সত্রীয়া, ডেকা (যুবক) অধিকার বা ডেকা সত্রীয়া।

২. সত্রের ভক্ত এবং কার্যাধিকারিক

৩. শিষ্য।

'অধিকার'-কে সত্রের প্রধান পুরুষ বলা যায়। তিনি সত্রের সকল ধর্মকার্যের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রধান গুরু। তিনি 'শরণ', 'ভজন', 'মালা', 'মন্ত্র' ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সাধনায় শিষ্যদের দীক্ষিত করে ধর্মের পথ প্রদর্শন করেন।

অসমে পাঁচশোর অধিক সত্রের কথা জানা যায়।

মাধব কন্দলি

প্রাক্-শংকরদেব যুগের (শংকরদেবের জন্ম ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে। তার পূর্ববর্তী সময়কাল) কবিদের মধ্যে মাধব কন্দলি অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শ্রেষ্ঠ। ইনি অসমিয়া ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন।

'বাল্মীকি রচিলা শাস্ত্র গদ্য-পদ্য ছন্দে।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে।।
আপনার বুদ্ধি অর্থ যিমত বুঝিলো।

সংক্ষেপ করিয়া তাক পদ বিরচিলো।।'

কবি নিজেকে মাধব কন্দলি বিপ্র বা দ্বিজবর মাধব কন্দলি-রূপে অভিহিত করেছেন। কবিরাজ উপাধি তিনি সম্ভবত তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা বা কোনো পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

মাধব কন্দলি রাজা শ্রীমহামাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর কাব্য রচনা করেন। পণ্ডিত মাধবচন্দ্র বরদলৈ মনে করেন শ্রীমহামাণিক্য জয়ন্তাপুরের জয়ন্তা কছারি রাজা বিজয়মাণিক, ধনমাণিক ও যশমাণিক এই তিনজনের একজন হবেন। জয়ন্তাপুরের কছারি রাজাদের বরাহী রাজা হিসেবেও জানা যায়। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গেইট বিজয় মাণিক ও ধনমাণিকের রাজত্বকাল ১৫৬৪-৮০ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৪৯৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ নির্ণয় করেছেন।

সূর্যখড়ি দৈবজ্ঞ *অথবা* **'দরং রাজবংশাবলী'**

দরঙের রাজা সমুদ্রনারায়ণের আদেশে বলদেব সূর্যখড়ি দৈবজ্ঞ কোচ রাজাদের বিবরণ 'শিব-বংশাবলী' বা 'রাজবংশাবলী' রচনা করেন। এই গ্রন্থটিই 'দরং রাজবংশবলী' নামে মুদ্রিত। এবং এটিই 'সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী' নামে পরিচিত। রচনা কাল আমানত উল্লা চৌধুরির মতে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ আর এডওয়ার্ড গেইটের মতে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ।

পুথির প্রথম ভাগে পরশুরাম কর্তৃক সমগ্র বসুন্ধরা নিঃক্ষত্রিয়করণ ও শিববীর্য হতে বিশ্বসিংহের জন্মকাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

বুরঞ্জি *অথবা* **অসম বুরঞ্জি**

অসিময়া ভাষায় ইতিহাসের প্রতিশব্দ বুরঞ্জি আহোম ভাষা থেকে আগত। ত্রয়োদশ শতকে ভারতের এই উত্তরপূর্ব প্রান্তে চুকাফার প্রবেশের পর (১২২৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকেই বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করার চল হয়েছিল। সর্বপ্রথম আহোম ভাষায় বুরঞ্জি লেখা হত। আহোমগণ স্থানীয় সমাজে মিলেমিশে যাওয়ার পর থেকে বুরঞ্জির মাধ্যম অসমিয়া ভাষা হয়।

আধুনিক অর্থে বা তাৎপর্যে বুরঞ্জি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস নয়। যদিও ইতিহাসের নানা উপাদান এই বুরঞ্জিগুলোতে পাওয়া যায়।

অসম দেশে আহোমদের শ্রেষ্ঠ দান ইতিহাস(বুরঞ্জি) রচনার প্রচলন।

বুরঞ্জিকে জ্ঞানের একটি উৎস বলে গণ্য করা হত। রাজকুমার তথা সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকদের শিক্ষার অঙ্গ ছিল বুরঞ্জি। আহোম যুগে লেখা এইসকল বুরঞ্জির সংখ্যা আনুমানিক দেড় শতাধিক। বুরঞ্জি নানা ভাগ তথা প্রকৃতি আছে—যেমন—

ক. আহোম বুরঞ্জি [আহোমদের বিবরণ]

খ. অসম বুরঞ্জি [অসমের বিবরণ]

গ. অন্য দেশের বুরঞ্জি। যেমন— ত্রিপুরা বুরঞ্জি। পাৎশাহ বুরঞ্জি।

ঘ. তুঙ্খুঙিয়া বুরঞ্জি

ঙ. কামরূপ বুরঞ্জি

চ. কছারি বুরঞ্জি

ছ. জয়ন্তীয়া বুরঞ্জি ইত্যাদি।

কামরূপ

কামরূপ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে সুন্দর আকৃতি। অসমের প্রাচীন নাম কামরূপ। 'যোগিনীতন্ত্র' অনুসারে বর্তমান অসম ছাড়াও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত) রংপুর, ময়মনসিংহ জেলা (বর্তমান বাংলাদেশে) এককালে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপের বিস্তৃতি ত্রিশ যোজন। পরিসর এক শ যোজন। (এক যোজন = চার ক্রোশ। এক ক্রোশ = ৮০০০ হাত বা দুই মাইল। এক মাইল = এক কি.মি. ৬০৯ মি.)

'কালিকাপুরাণ' মতে, মহাদেবের কোপানলে ভস্মীভূত কামদেবকে পুনর্জীবন দান করার জন্য পত্নী রতিদেবী মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করলে কামদেব পুনর্বার এই দেশে জন্মলাভ করেন। যার ফলে এই দেশের নাম হল কামরূপ। বর্তমানে এটি অসমের রাজ্যের অন্যতম প্রধান একটি জেলা। এখানে অসমের রাজধানী দিসপুর অবস্থিত।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক নরপতি পুষ্যবর্মন। ইনি আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে রাজত্ব করতেন। প্রাচীন কামরূপ চার ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা— রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ এবং সৌমার পীঠ।

সামবেদ

বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে 'সামবেদ' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মহাভারতের 'অনুশাসন পর্বে' বলা হয়েছে যে বেদের মধ্যে সামবেদই শ্রেষ্ঠ। 'সামবেদশ্চ বেদনানাং'।

সাম-এর সংকলনই সামবেদ। যে-সকল মন্ত্র সুর সংযোগ করি গীত হত তাই সাম বলে অভিহিত। 'সামবেদ'-এর বেশির ভাগ মন্ত্র ঋগ্‌বেদ থেকে সংকলিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টই উল্লিখিত হয়েছে যে 'ঋক'-এর আধারে 'সাম'-এর সৃষ্টি। মোট ১৮১০ টি মন্ত্র সামবেদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর ৭০টি মন্ত্র বাদে বাকি সবকটিই মন্ত্র ঋগ্‌বেদে থেকে গৃহীত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে সামবেদের সহস্রশাখার উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে কেবল তিনটি শাখারই অস্তিত্ব আছে।

আহোম


আহোমদের বিবাহবাসর

অসমে বসবাসকারী বৃহৎ টাই গোষ্ঠীর অন্তর্গত সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী উত্তর-ব্রহ্মদেশ বা বর্তমান ম্যানমারের উত্তর অংশের হুকং উপত্যকার মাওলুং রাজ্য থেকে চ্যুকাফা নামে একজন রাজকুমারের নেতৃত্বে ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে অসমে এসে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এবং সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসর রাজত্ব করে। অসমে আগত এই টাই গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল 'শান' সম্প্রদায়ের বংশধর। সম্ভবত অসমে রাজ্য স্থাপন করে বসবাস করার দরুন স্থানীয় বোড়ো সম্প্রদায়ের লোকেরা আহোমদের রাজ্যকে 'হা-শান' (হা = মাটি, শান = টাই সম্প্রদায় বিশেষ) বলত। অর্থাৎ 'শান'-দের অধিকৃত ভূ-খণ্ড। তা থেকেই কালক্রমে আশান>আসাম>আহ্‌ম; আহোম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।



কোচ

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর তিব্বত-বর্মীর অন্তর্গত একটি প্রাচীন সংস্কৃতিবান জনগোষ্ঠী। 'কোচ' শব্দটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত 'কুরাচ', 'কম্বোজ', 'কোচ্চ' ইত্যাদি শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে পণ্ডিতদের অনুমান। কোচ-জাতির লোক ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ইত্যাদি দেশে বসবাস করে। অসমে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোচগণ অসমিয়া জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দেওধনি

দেওধনি অসমের লোকনৃত্য। দেওধনি শব্দটি 'দেবধ্বনি' শব্দ থেকে আগত বলেই মনে হয়। অন্যদিকে 'দেও' মানে দেবতা। আর 'ধনি' অর্থে রমণী, এমন অনুমানও ফেলে দেবার নয়। স্ত্রীলিঙ্গ 'দেওধনি' শব্দের পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ 'দেওধা'। যার গায়ে 'দেও' (দেব/দেবতা) ভর করে সেই দেবী সমতুল্যা। সর্বজ্ঞা। এবং সকলের ভয়-ভক্তির পাত্রী ও ভবিষ্যৎ বক্তা হয়! দেবতার বাণী ঘোষণা করা অথবা দেবতার গুণকীর্তন করাই হল দেওধনি নামের তাৎপর্য। দেওধনি নৃত্য হল কছারি সংস্কৃতির অবদান। কছারি, রাভা, মেচ, এবং কোচ সমাজে এই নৃত্যের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। নিম্ন অসমে 'মারৈ' পূজা ও 'দেওধনি' নৃত্যের প্রাধান্য বেশি। পূর্ণযৌবনা রমণীই দেওধনি নৃত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। দেওধনি চিরকুমারী। অনুষ্ঠান পরিবেশনের সময় দেওধনি বিশেষ সুরুচিপূর্ণ সাজপোশাক পরিধান করে। দেওধনি নৃত্য সম্পর্কে সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণে বর্ণনা আছে।

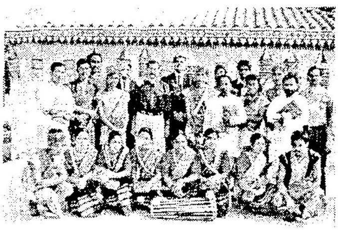


ডিমাসা

বুরঞ্জির বর্ণনা অনুসারে ডিমাসারা বোড়ো জাতির শাখাভুক্ত। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠী অসমের ডিমা হাসাও জেলা, কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমা, কার্বি আংলং জেলার সমতল অঞ্চল, নগাঁও জেলা, নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিমাপুর, ধনসিড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে।

কথিত আছে ডিমাপুরে আসার পর থেকেই তাদের নাম হয় ডিমাসা। ডিমাসা ভাষায় ধনসিড়ি নদীর নাম ডিমা। ডিমাসা শব্দের অর্থ ডিমা নদীর পাড়ে বসবাসকারী লোক। ডিমা অর্থ বড় নদী। ছা অর্থে সন্তান। অর্থাৎ বৃহত্তর নদীর সন্তান। ডিমাসা ভাষায় ডি মানে জল।

ডিমাসারা ডিমাপুরে ৪৫০ বছর রাজত্ব করেছিল। আনুমানিক ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দে তারা ডিমাপুরে রাজধানী স্থাপন করে। এবং ১৫৩৬ সালে ডিমাসারা ডিমাপুর ত্যাগ করে। এঁদের শেষ রাজা গোবিন্দ চন্দ্র ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।



রাভা

১৯০৩ সালে প্রকাশিত Grierson সাহেব প্রণীত 'Linguistic Survey of India'-গ্রন্থে যে মানচিত্র ছাপা হয়েছে, তাতে বর্তমান গারো পাহাড় জেলার 'ফুলবাড়ি' থেকে দক্ষিণ কামরূপের রানি (জায়গার নাম) পর্যন্ত বিস্তৃত গারো পাহাড় এবং খাসিয়া পাহাড় জেলার কিছু অঞ্চল রাভাদের

বাসভূমি।

অসমে বসবাসকারী জনজাতীয় লোকেদেরে ন্যায় 'রাভা'-রাও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত বোড়ো গোত্রাধীন জাতি বিশেষ। পণ্ডিত হডসনের মত— রাভারা গরিষ্ঠ বোড়ো পরিবার-ভুক্ত লোক। আবার ডেল্‌টন সাহেবের মত— রাভা এবং হাজংরা কছারি জাতির শাখা ও গারোদের সঙ্গেই সম্বন্ধিত।

রাভাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পণ্ডিত J.E. Friend-Pereira সাত ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন— রাংদানিয়া, পাতি, মায়তারিয়া, কোচ, দাহরিয়া, বইতালিয়া ও ছোঙ্গা।

গায়ন-বায়ন



নাটশালায় ভাওনা (পৌরাণিক নাটপালা) উদ্‌বোধনের অনুষ্ঠান পূর্বরঙ্গ। যেখানে একদল গায়ন-বায়ন খোল-মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। এটি এক প্রকার দীর্ঘ সংগীতযাত্রা। এতে পাঁচ থেকে পঞ্চাশজন গায়ন (যাঁরা মৃদঙ্গ বাজান) বায়ন (যাঁরা করতাল বাজান) বাদনে অংশগ্রহণ করেন। আহোম রাজার আমলে এঁরা একটি সম্প্রদায় হিসেবেই চিহ্নিত হতেন।

বরগীত

অসমিয়া বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যের প্রধান দুটি ধারা। একটি হল 'বরগীত' অন্যটি 'ভটিমা'। ভটিমা শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রশস্তি। ড. বাণীকান্ত কাকতি বরগীতকে বলেছেন noble numbers। কালিরাম মেধি বলেছেন song celestial। বরগীতে আছে বেদান্তের মর্ম। আর আছে বিশ্বম্ভর 'ভগবান স্বয়ং' শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ব-বিমোহন বাল্যরূপের বিবরণ। বরগীত সাংসারিক জগতের প্রেম-কাহিনি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরগীত অসমের ক্লাসিকেল বা ধ্রুপদী সংগীত। শংকরদেব ও মাধবদেব উভয়ের রচিত এই বরগীতের সংখ্যা সর্বমোট ১৯১। স্মর্তব্য, একই রাগ-তাল এবং ভাব ভাষায় বিরচিত অন্য কোনো কবির রচিত গীতকে বরগীত বলা হয় না।

চিলারায়

মহাবীর চিলারায়। কোচ রাজশক্তির শৌর্য-বীর্য এবং দুরন্ত সাহসের প্রতীক-স্বরূপ। মহারাজ নরনারায়ণের (১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ— ১৫৮৭খ্রিস্টাব্দ) ভ্রাতৃ এবং কোচ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। চিলারায়রে প্রকৃত নাম ছিল শুক্লধ্বজ। চলের মতো উড়ে সেই সময়ের আহোম রাজ্য, জয়ন্তীয়া, খৈরাম (খাসিয়া রাজা) ত্রিপুরা ইত্যাদি উত্তরপূর্বের সমস্ত রাজ্য জয় করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় চিলারায়। যুদ্ধে প্রদর্শিত নিপুণতার জন্য তিনি 'সংগ্রাম সিংহ' উপাধি পেয়েছিলেন। শংকরদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। এবং একশরণ নামধর্মের প্রচার কার্যে ব্রতী হন। আহোম ও কোচ রাজ্যের সমন্বয় সেতু ছিলেন চিলারায়।

মাধবদেব

মহাপুরুষ শংকরদেবের (১৪৪৯—১৫৬৮) অন্যতম শিষ্য। অসমের নববৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার মাধবদেব। বর্তমান উত্তর লখিমপুর জেলার নারায়ণপুর অঞ্চলে ছিল কাচিকটা নদী। এই নদীর পাড়ে হরশিঙা বরার গৃহে গোবিন্দগিরি ভূঞার পত্নী মনোরমার গর্ভে মাধবদেবের জন্ম হয় ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে। চোদ্দ বছর বয়সে দেশে

আকাল পড়লে মাধবদেব পিতৃমাতৃ-সহ ইতস্তত ঘুরে বেড়ান জীবিকার দায়ে। এবং হাবুং অঞ্চলের ঘাগর মাঝির গৃহে দুই বৎসর কাল যাপন করেন। পরে মাধবদেবের পিতা গোবিন্দগিরি তাঁর পূর্বস্থান বান্ডুকা (বর্তমান বাংলাদেশের রংপুরে অবস্থিত) চলে যান। এখানে মাধবদেব বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করে বান্ডুকার রাজপরিবারে কর্মে নিয়োজিত হন। এরপর কিছুদিন তিনি পান-তাম্বুলের ব্যবসা করেন। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে শংকরদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। এবং তাঁর কাছে ভক্তিধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ নাম-ঘোষা, জন্ম-রহস্য ইত্যাদি। এবং বরগীত রচনায় তাঁর সহিত্যকৃতির পরিচয় বিদ্যমান।

শংকরদেব



১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে নগাঁও জেলার বরদোয়ায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল কুসুম্বর ভূঞা। মাতাব নাম সত্যসন্ধ্যা। অসমে নববৈষ্ণব ধর্ম তথা একশরণ নামধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীমন্ত শংকরদেব। শ্রীমন্ত শংকরদেব অসমিয়া জাতীয় জীবনের মহাপুরুষ। তিনি ভক্তিমূলক গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ, অঙ্কীয়া নাট, বরগীত ইত্যাদি রচনা করে অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত্তি সুদৃঢ় করে গেছেন। সর্বোপরি সামাজিক সমতায় এক মহাজাতীয়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা তাঁর সর্বোত্তম কৃতিত্ব। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে শংকরদেবের প্রয়াণ ঘটে।

হরিহর বিপ্র

'লব কুশের যুদ্ধ' ও 'বব্রুবাহনের যুদ্ধ' এই দুটি গ্রন্থ রচয়িতা হরিহর বিপ্র একই ব্যক্তি বলে অনুমান করা হয়। এই কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা দুর্লভনারায়ণ। দুর্লভনারায়ণ ছিলেন কামতার (কামতাপুর) রাজা। ইনি সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে (১২০১—১৩০০ খ্রি.) কামতার রাজা ছিলেন।

হরিহর বিপ্র জৈমিনি থেকে রামকথার পদ রচনা করেন। কিন্তু 'গৌরীর চরণ' সেবক বলে উল্লেখ করায় তাঁকে শাক্ত বলে অনুমান কববার অবকাশ আছে। প্রাক্-শংকর যুগের অসমিয়া সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি হরিহর বিপ্র।

চরিতপুথি

'গুরুচরিত'-এর বৃত্তান্তমূলক পুথি। গুরু এখানে সাধারণত শংকরদেব তথা মাধবদেব বা তাঁদের মতো কোনো মহাপুরুষ। অসমিয়া সাহিত্যের মধ্যযুগে চরিতপুথি রচনার জোয়ার এসেছিল বলা যায়। অসমের বৈষ্ণব-সত্র সমাজে 'চরিত-তোলা' প্রথা ছিল। চরিতপুথি গুলোর মধ্যে 'কথাগুরু-চরিত' সর্বমান্য গ্রন্থ। এটি কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। লিখিত চরিতপুথির মধ্যে দৈত্যারি ঠাকুর-এর 'গুরুচরিত' অন্যতম। এ ছাড়া রামানন্দ দ্বিজ রচিত 'শঙ্করদেবর চরিত' উল্লেখযোগ্য।

আউনিআটি সত্র

আউনিআটি সত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিরঞ্জন দেব। মহাপুরুষ শংকরদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব সমাজে অন্তর-কলহ দেখা দেয়। ফলে মহাপুরুষীয়া ও দামোদরিয়া এই দুই উপশাখায় বৈষ্ণব সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। এবং ভক্ত দামোদর দেবের হাতে 'সত্র' আনুষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। এই 'সত্র' চার প্রকারে বিভক্ত। ব্রহ্ম সংহতি, নিকা (পবিত্র) সংহতি, পুরুষ সংহতি এবং কাল সংহতি।

আউনিআটী সত্র ব্রহ্ম সংহতির অন্তর্গত এবং রাজপৃষ্ঠপোষকতার অধীন। এটি উজান অসমে অবস্থিত।

মহারাজ জয়ধ্বজ সিংহ (১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ — ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দ, রাজত্বকাল) এই সত্র নির্মাণের কাণ্ডারী। তাঁকে শরণীয়া রাজাও বলা হয়।

যোগিনীতন্ত্র

মহাযোগিনী মহাকালীর আদেশে মহাযোগী আশুতোষ শিবের প্রথম প্রকাশ এই যোগিনীতন্ত্র। তন্ত্রসমূহের মধ্যে যোগিনীতন্ত্র অন্যতম। যোগিনীতন্ত্রের বিষয়বস্তু যোগিনীগণের সাধন প্রণালী, মন্ত্রোদ্ধার, জারণ, মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ প্রভৃতি। এ ছাড়াও অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য অতি আবশ্যকীয় বিষয় যোগিনীতন্ত্রে সন্নিবেশিত আছে বলে পণ্ডিতগণের ধারণা।

বিশ্বসিংহ

কোচ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ — ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড় রাজা হোসেন শাহ কামতাপুর রাজ্য ধ্বংস করেন। ফলে অনেক ছোট রাজা বা ভূঞার আবির্ভাব ঘটে। এই সময় চিকনগ্রামের হাড়িয়া মেচ-এর পুত্র বিশু সুযোগ বুঝে উগুরি, লুকি, ফুলগুরি, বিজনি এবং অন্যান্য স্থানের ভুঞাদের পরাজিত করে বরনদীর পার থেকে করতোয়া নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এটিই কোচ রাজ্য। এবং এই বিশুই হল মহারাজ বিশ্বসিংহ। চিকনগ্রামে বিশ্বসিংহ রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারে রাজধানী স্থানান্তর করেন। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মল্লদেব নরনারায়ণ নাম ধারণ করে কোচরাজ্যের অধিপতি হন। এবং ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। নরনারায়ণের আশ্রয়ে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব তাঁর সাহিত্যচর্চা করেন।

চর্যাপদ

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। এটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ — ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করেন, ১৯০৭ সালে। পুথিটির আসল নাম চর্যাগীতিকোষ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাম দেন চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। ১৯১৬ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) থেকে চর্যাপদ প্রকাশিত হয়। এর ভাষা সন্ধ্যাভাষা নামে পরিচিত। চর্যাপদের পুথিতে ৫০টি পদ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ উদ্ধার করেন। চর্যাগানগুলির মুনিদত্ত-কৃত সংস্কৃত টীকা থেকে এর ভাবার্থ বোধগম্য হয়। চর্যার রচনাকারদের মোট সংখ্যা ২২। চর্যার কবিরা সকলেই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। চর্যার ভাষা যে বাংলা তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) প্রমাণ করেছিলেন। অবশ্য অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার দাবিও ফেলনা নয়। চর্যার কিছু কিছু পদে কামরূপের ভৌগোলিক ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। এটির তিব্বতি অনুবাদ করেন পণ্ডিত শীলাচারী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কারের বহুকাল পরে পণ্ডিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২৫০টি নতুন চর্যাগান আবিষ্কার করেন। সেখান থেকে ৯১টি পদ বেছে নিয়ে ১৯৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'নব চর্যাপদ' নামে প্রকাশ করেন। চর্যার পদকারগণের মধ্যে লুইপাদ হলেন আদিতম। অন্যতম চর্যাকার হলেন কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, ঢেন্ডনপাদ, শবরপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি।

চুহুংমুং

চুহুংমুং দিহিঙ্গিয়া রাজা নামে খ্যাত। আহোম রাজা চুপিমফার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চুহুংমুং সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭—১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে পড়ে তিনি স্বর্গনারায়ণ উপাধি গ্রহণ করেন। আহোম রাজদরবারে দুজন মন্ত্রী পর্যায়ের কর্তাব্যক্তি থাকতেন। একজন বুড়া গোহাঁই এবং অন্যজন বর গোহাঁই। চুহুংমুং তৃতীয় একটি মন্ত্রীপদ সৃষ্টি করেন, এবং তা হল বরপাত্র গোহাঁই। এবং চুহুংমুঙের সৎ ভাই চেংলুং এই তৃতীয় মন্ত্রীপদে আসীন হলেন। দায়িত্ব পাবার পর তিনি কনচেং নাম ধারণ করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে চুহুংমুং জাতি গণনা শুরু করেন, যদিও তা হালের আদমশুমারির মতো সুপরিকল্পিত ছিল না।

লোকায়ত

চার্বাক দর্শনের অপর নাম লোকায়ত। ইংরেজি Folk শব্দটির অনুবাদ 'লোক'। চার্বাক ছিলেন বস্তুবাদী। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৮ম শতকে (৮০০ খ্রিস্টাব্দে) 'লোকায়ত' শব্দের আবির্ভাব। লোকায়তের সংজ্ঞা হল 'লোকেষু আয়ত'। সাধারণ অর্থে লোকায়ত বলতে (সাধারণ) জনগণের মত বা দর্শনকে বোঝায়। যেমন— লোকায়ত দর্শন। এতে পরজন্মের স্থান নেই। আত্মার অস্তিত্ব লোকায়ত স্বীকার করে না। সম্ভবত এ কারণেই 'লোকায়ত'র লোক অবজ্ঞার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। লোকায়ত প্রান্তবাসী লোকের জীবনদর্শন।

কারবি



অসমের অন্যতম নৃগোষ্ঠী কার্বি। আগে কার্বিরা মিকির নামে পরিচিত ছিল। সেই পরিচয় ছিল ভুল। মিকিরদের পুরাকথা অনুসারে তাদের আদি বাসস্থান নংপিলার আদি অরণ্যপ্রদেশ। তাদের ঈশ্বর চিনথং। মিকিররা কছারি রাজার অধীন ছিল। কছারি রাজাকে মিকির ভাষায় বলে কুলারজা।

বোড়ো



'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত'(১৯১০) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ কছারিদের মধ্যে একসময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়ায় অনুমান করেছেন যে বুদ্ধছা থেকে বডোছা বা বড়ো [বোড়ো] নাম সৃষ্ট হতে পারে। অসম তথা পূর্ব-ভারতে বোড়োদের বাস। এরা চীন-তিব্বতীয় (মঙ্গোলীয়) গোষ্ঠীর লোক। বোড়ো শব্দের অর্থ প্রাচীন বোড়ো ভাষায় মানুষ বোঝাত। আজও ত্রিপুরাবাসী কছারিরা টিপ্রা ভাষায় (ত্রিপুরি ভাষায়) মানুষ অর্থে 'বরোক্' শব্দের ব্যবহার করে। যোগিনীতন্ত্রে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর এই মানুষদের কিরাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। বোড়ো ভাষায় ব্রহ্মপুত্রকে বলে 'বুলুৎ-বুথুর'। বোড়োদের মতে আদি মানব-মানবী মৌন্‌ছিংছিং-এর আমরা হলাম সন্তান।

প্রশ্নাবলি

১. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

ক. প্রাচীন ভারতে সংগীতের বাদ্যযন্ত্রগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. চার ভাগে
২. পাঁচ ভাগে
৩. তিন ভাগে
৪. সাত ভাগে

উ. চার ভাগে।

খ. তারের সুরযন্ত্র হল—

ক. ঢোল
খ. কাঁসা
গ. ডুগডুগি
ঘ. বাঁশি

উ. ডুগডুগি

গ. দুটি বস্তুর সংঘাতে বাজানো তালযন্ত্র

ক. খোল
খ. মাদল
গ. বীণা
ঘ. করতাল

উ. করতাল

২. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

ক. তারের দুটি সুরযন্ত্রের নাম লেখো।

উ. বীণা, সরোদ।

খ. পাশ্চাত্য দুটি বাদ্যযন্ত্রের নাম বল।

উ. বেগপাইপ, গিটার।

গ. মেঘগর্জনের অনুকরণে সৃষ্ট বাদ্যযন্ত্রের একটি উদাহরণ দাও।

ঘ. দশরূপক কার লেখা?

ঙ. কমলপ্রিয়া কে?

৩. প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

ক. রাভাদের দুটি বাদ্যযন্ত্রের নাম বলো।

উ. বাদুংদোপা, লাখর বাঁশি।

খ. প্রাক্-শংকরদেব যুগ বলতে কোন সময়কে বোঝায়?

উ. শংকরদেবের জন্মের (১৪৪৯) আগের সময় অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী (১৩০১-১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ)।

গ. অসমের পাঁচটি লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের নাম লেখো।

ঘ. লোকায়ত কথার অর্থ কী?

ঙ. লোকসংগীত কাকে বলে?

চ. অসমের রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি দৃষ্টান্ত দাও।

4. একটি বাক্যে উত্তর দাও।

ক. সামবেদ কী?

খ. বুরঞ্জি কী?

গ. মাধব কন্দলি কে ছিলেন?

ঘ. বৈষ্ণব যুগ বলতে কোন সময়কে বোঝায়?

উ. আনুমানিক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী (১৫০০—১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) কালসীমাকে অসম ও বঙ্গদেশে বৈষ্ণব যুগ বলে ধরা হয়।

ঙ. একজন আহোম রাজার নাম বলো।

চ. চিলারায় কে ছিলেন?

ছ বিশ্বসিংহ কে?

জ. মোগল প্রভাবে প্রচলিত অসমের বাদ্য কোনগুলো?

৫. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও।

ক. কাষ্ঠ বা কাঠ নির্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলির নাম বলো।

খ. তার সহযোগে তৈরি বাদ্যযন্ত্রগুলোর নাম বলো।

গ. প্রাক্-শংকরদেব যুগে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রগুলির পরিচয় দাও।

ঘ. বৈষ্ণব-যুগের বাদ্যযন্ত্রগুলির পরিচয় দাও।

ঙ. অসমের বুরঞ্জিতে প্রাপ্ত বাদ্যযন্ত্রসমূহের বিষয়ে আলোচনা করো।

চ. কামরূপের ঢুলিয়াদের সম্বন্ধে যা জান লেখো।

৬. রচনাধর্মী উত্তর লেখো।

ক. অসমে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখো।

খ. অসমে প্রচলিত লোকব্যদ্যের পরিচয় দাও।

গ. অসমের বাদ্যযন্ত্রে বহিরাগত প্রভাব কীভাবে পড়েছে আলোচনা করো।

ঘ. ব্রিটিশ যুগের বাদ্যযন্ত্র ও প্রাক্‌শংকরদেব যুগের বাদ্যের তুলনামূলক আলোচনা করো।

ঙ. প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের বিষয়ে যা জান লেখো।

৭. শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করো।

ক. বাদুংদোপা কারবি সমাজে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র — (অশুদ্ধ)

খ. নাকাড়া উত্তর-ভারতের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

গ. দশরূপক-এর লেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

ঘ. সুরবাহার ব্রিটিশ যুগে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র।

ঙ. চর্যাপদে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্র হেরুকবীণা।

চ. হরিহর বিপ্র রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

৮. শূন্যস্থান পূরণ করো।

ক. চুহুংমুং —— রাজ্য জয় করেন।

উ. চুটিয়া রাজ্য।

খ. —— বিশ্বসিংহের দেওয়ান ছিলেন।

গ. বিশ্বসিংহ —— রাজা ছিলেন।

ঘ. —— সত্রে ঢোলকের বব্যহার প্রচলিত হয়।

ঙ. বৈষ্ণবদের জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র ——।

৯. **'ক' অংশের সঙ্গে 'খ' অংশ মিলাও।**

ক. চুহুংমুং ——	১. পেপা
খ. চর্যাপদ ——	২. ঢাক
গ. পারসিক বাদ্য ——	৩. পাখোয়াজ
ঘ. আহোম ——	৪. রবাব
ঙ. কোচরাজা ——	৫. আহোম রাজা
চ. কোচ রাজ্যে প্রচলিত ——	৬. বিশ্বসিংহ
ছ বাতাস সহযোগে বাজে ——	৭. রাজবংশ
জ. মোগল যুগের বাদ্য বিশেষ ——	৮. হেরুক বীণা

১০. **এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দ লেখো।**

ক. খোপাজয়া — পাখোয়াজ

খ. লদমা —

গ. বাবর —

ঘ. লতাবর —

ঙ. লাচিয়রা —

চ. পাপে —

ছ মাডিসা —

জ. দমবেসা —

ঝ. দোরাতা —

১১. **শূন্যস্থানে সঠিক বর্ণমালা বসিয়ে শব্দ তৈরি করো।**

ক. —হুং—ং

খ. — দঙ্গ

গ. —ম—দ

ঘ. কা — — প

ঙ. হরি—র

চ. —ধব ক—লি

১২. অসমের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। [২০০ শব্দের মধ্যে]

১৩. বাঙালির ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করো।

১৪. **সহজ শেখা।**

১. ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা তোমাদের বাড়িতে যে-সকল বাদ্যযন্ত্র আছে তার নাম লেখো।

২. তোমাদের গ্রামের নাটমন্দিরে যে-সকল বাদ্যযন্ত্র আছে তার নাম লেখো।

৩. তোমাদের উৎসব অনুষ্ঠানে, কীর্তন, সংকীর্তনে যে-সকল বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তার নাম লেখো।

৪. ইসলাম ধর্মী মানুষেরা কী-রকম বাজনা বাজায় তার নাম লেখো।

১৫. **প্রকল্প প্রস্তুত করো।**

ক. পাঠটি অনুসরণ করে অসমের বাদ্যযন্ত্রের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করো।

খ. উপজাতি বন্ধুরা যেমন— কারবি, ডিমাসা, মণিপুরি, নেপালি, খাসিয়া, নাগা, কুকি, জয়ন্তিয়া, গারো, কছারি ইত্যাদি, এই সকল জনগোষ্ঠীদের বাদ্যযন্ত্রের কথা নিয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করো।

জ্বালানি হিসাবে কয়লার পরিবর্তে তেলের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় তেল থেকে জলদূষণের মাত্রা বেড়ে গেছে। জলের পৃষ্ঠদেশে তেলের আস্তরণ জলের অক্সিজেন শোষণে বাধা দেয়।

এ ছাড়া মানুষ উন্নয়নের তাগিদে দেশের জলসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তার অপব্যবহার করে। প্রায় ৫০০০ বছর আগে ইজিপ্ট প্রথম বাঁধ তৈরি করে। কৃষির উৎকর্ষ বাড়াতে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে অথবা জলের নির্ভরযোগ্য উৎসের জন্য এরকম বাঁধ ও জলধারের প্রয়োজনীয়তা আমাদের প্রগতির অন্যতম চাবিকাঠি হয়ে পড়েছে। মানুষের তৈরি এইসব বিশাল বাঁধ ও জলাধারের জন্য পরিবেশ প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য হারায়।

দূষিত মাটি ও ভূমিক্ষয়

মাটির সঙ্গে জল ও বাতাসের নিকট সম্পর্ক, তবু তাদের দূষণের বিশেষ পার্থক্য হল মাটিতে দূষণ অনেকদিন জমে থাকতে পারে। জলে ও বায়ুমণ্ডলে তা সম্ভব হয় না।

শহরাঞ্চলের ও কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থ মাটি দূষণের অন্যতম উপাদান। কয়লা, খনিজ শিল্প, ধাতু শোধনাগার ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প থেকে এইসব উপাদান বিভিন্ন স্থানে স্তূপীকৃত হলে তাতে সীসা, তামার মতো বিষাক্ত কিছু কিছু ধাতুও থাকে। শহরাঞ্চলের বর্জ্য পদার্থে, খাদ্য অবশেষ থেকে শুরু করে ভাঙাচোরা নানা জিনিসপত্র জঞ্জাল হিসাবে জমা হয়। এসব জঞ্জালের জন্য মাছি ইঁদুর সংখ্যায় বেড়ে যায়। এক ঘনফুট জঞ্জাল প্রায় ৭০ হাজার মাছির সূতিকাগার হতে পারে।

আধুনিক নিবিড় চাষের দৌলতে সার, কীটনাশক দ্রব্যাদির ব্যবহার বাড়ছে। এসব পদার্থের জঞ্জালও মাটি দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। কৃত্রিম সারের ব্যবহার যেমন মাটির সুরক্ষা করে, তেমনি তার দূষিত অংশ মাটির দূষণ বাড়ায়। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে গোয়াল ও পোল্ট্রি থেকে আবর্জনার পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে। এসব আবর্জনা থেকে রোগ জীবাণুবাহী মাছি কীট পতঙ্গের জন্ম হয়।

নিউক্লিয় বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিউক্লিয় বিস্ফোরণ থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে তেজস্ক্রিয় দূষণের সৃষ্টি করে। কোনো উদ্ভিদ এ মাটিতে জন্মালে তাতে ওইসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ সঞ্চিত হয়। আবার ওই উদ্ভিদ প্রাণীর খাদ্যে ব্যবহৃত হলে তার দেহেও এসব পদার্থ সঞ্চিত হয়ে তেজস্ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর ফলে গামা বিকিরণে প্রাণীদেহের জীবকোষ অচিরেই বিনষ্ট হয়।

সাধারণ দূষণেব তুলনায় তেজস্ক্রিয় দূষণের পার্থক্য হল, সাধারণ দূষণ যেখানে ব্যক্তি হিসাবে মানুষের ক্ষতি করে, তেজস্ক্রিয়ার দূষণ মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরেরও ক্ষতি করে। তেজস্ক্রিয়ার বিকিরণ ক্যানসার ঘটায়, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেয় ও বংশানুক্রমের পরিবর্তন ঘটায়। তেজস্ক্রিয়ার বিকিরণ এমনকী ভ্রূণস্থ শিশুরও ক্ষতি করে।

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান নিউক্লিয় যুগের প্রগতি মনুষ্য সমাজে বিপুল সংকটের সৃষ্টি করেছে। চিকিৎসায় এক্স রশ্মির ব্যবহার, রঙিন টিভি, ঘড়ির প্রতিপ্রভ ডালায়, এক্স রশ্মি ফ্লোরোস্কোপ প্রভৃতি এই সংকটের উপর বাড়তি বোঝা।

অবশ্য ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ হল বনাঞ্চলের বিনাশ সাধন ও কৃষিকার্যের প্রসার। বনাঞ্চল মাটিকে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা থেকে বাঁচায় ও মাটির ক্ষয় মন্দীভূত করে। বনাঞ্চল ছাতার মতো ভূমিকা নিয়ে বৃষ্টির ফোঁটাকে ভেঙে ছোটো করে দেয়। তাদের বেগ কমার ফলে বৃষ্টির গতিশক্তি হ্রাস পায়। তা ছাড়া বনাঞ্চলের মাটিতে যে জৈব পদার্থের প্রাধান্য থাকে তা বৃষ্টির জল শোষণ করে। গাছের শিকড় প্রচুর জল টেনে নিতে পারে। এই মাটি যেমন সহজে ভেজে না, তেমনি বৃষ্টির বেগও সংযত করে। গভীর শিকড়যুক্ত গাছ-পালা মাটি আঁকড়ে ধরে তার চারপাশের মাটির সুরক্ষা করে।

শব্দ দূষণ

আমাদের পরিবেশে নানা শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। সব শব্দই যে আমাদের ক্ষতি করে তা নয়। তবে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে শব্দের পরিমাণ বেড়েই চলেছে— যা আমরা ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এই শব্দ হল অপস্বর (noise) যা মানুষের ক্ষতি করে। সংগীতের সুস্বর এই শ্রেণিতে পড়ে না। তবে অ্যামপ্লিফায়ারে বিবর্ধিত সংগীত অথবা পপ ইত্যাদির সংগীতের ঢক্কানিনাদ থেকে সাবধান হতে হবে।

শব্দ হল চাপ তরঙ্গ— এই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক শব্দের তীক্ষ্ণতা-নির্দেশক, শব্দের তরঙ্গের বিস্তার তার প্রাবল্যের মাপকাঠি। এই বিস্তারের এককককে ডেসিবল বলা হয়। অপস্বরের প্রাবল্যে যে উচ্চস্বরের সৃষ্টি হয় তা বিপজ্জনক।

আমাদের ক্ষতি করে এরকম অপস্বর আসে প্রধানত যানবাহনের শব্দ থেকে। মোটর গাড়ি বিশেষত ডিজেল গাড়ির অপস্বরের প্রধান উৎস। জেট প্লেন-এর অতিশব্দ প্রাণীজগতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে। এই শব্দ থেকে মানসিক রোগেরও সঞ্চার হতে পারে।

আকস্মিক অপস্বর অবিরাম অপস্বরের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। আকস্মিক অপস্বরে স্থায়ী বধিরতাও সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ কম্পাঙ্কের উচ্চস্বরের সংস্পর্শে অধিক সময় থাকলে এমনকী সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

অপস্বর দূষণ যে শুধু কানের ক্ষতি করে তা নয়, হৃদস্পনের হারেরও তারতম্য ঘটায়। সুস্থ মানুষের ব্লাড প্রেশারের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের বিকলতায়ও অপস্বরের প্রভাব আছে।

শব্দ দূষণ এড়াতে কল-কারখানায় উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। (১) প্রথমত, কম অপস্বর উৎপন্ন করবে এরকম বিকল্প যন্ত্রপাতি কল-কারখানায় ব্যবহার করা যেতে পারে। (২) শব্দনিরোধক পদার্থে যন্ত্রপাতি ঢেকে রাখা যায়। (৩) কানের ঢাকা পরে শব্দবহুল কারখানার কর্মীরা কাজ করতে পারে।

বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক

উনিশ শতক থেকে আমাদের সভ্যতায় যে প্রগতি ঘটেছে তার ফল হয়েছে এই যে বিপুল পরিমাণে দূষণের উৎস পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই দূষণ বছরের পর বছর পুঞ্জীভূত হয়ে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এসব সমস্যার কথা মনে রেখে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে জুনে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে একটা আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়ে গেল। আর্‌থ্ সামিট বা বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক নামে পরিচিত রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বড়ো ছোটো সব দেশই প্রায় যোগ দিয়েছিল। এক কথায় তা ছিল বিশাল আকারের আন্তর্জাতিক আলোচনচক্র। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে, আমাদের বাসভূমির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই সার্বিক প্রচেষ্টা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যে পুরোপুরি সফল হয়েছে তা বলা যাবে না। এখানে বৈজ্ঞানিক কোনো যুক্তিতর্ক ছিল না, ভবিষ্যৎ পরিবেশ দূষণের সম্ভাব্যতা অথবা ফলাফলের অনিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা ছিল না। কারণ এটা বিজ্ঞানের নয় বরং রাষ্ট্রনেতাদের আলোচনাচক্র। স্বভাবতই নীতি নির্ধারণের দিগ্‌দর্শন নিয়ে এখানে লড়াই চলেছে। উন্নতিকামী দেশগুলোর দাবি ছিল পরিবেশ দূষণের প্রধান দায়ভাগ বর্তায় উন্নত দেশগুলির ওপর, কারণ তারাই তো এজন্য প্রধানত দায়ী। তাই তারাই উদ্যোগ নিক। শিল্পের প্রসার তো এই সব দেশেই বেশি। তাদের আরও দাবি ছিল উন্নত দেশগুলো শুধু পরিবেশ সংরক্ষণে প্রযুক্তি দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করলেই চলবে না, এজন্য আর্থিক সাহায্যও দিতে হবে। উন্নত দেশগুলোর পাল্টা যুক্তি ছিল উন্নতিকামী দেশগুলোর জনস্ফীতির হার বেশি। তাই পরিবেশ দূষণে তারও প্রভাব পড়ে।

পুরোপুরি সফল না হলেও এই বৈঠকে অন্তত একটা মতৈক্য বজায় ছিল যে আমাদের পরিবেশ যেভাবে দূষিত

হচ্ছে তাতে বসুন্ধরা বিপন্ন। পদ্ধতি নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও পরিবেশের উন্নতি যে একান্ত প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তে কোনো মতদ্বৈধ ছিল না। আগামী শতকে গবেষণার পরিধি বাড়াতে হবে ও সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে— মানুষের সৃষ্ট সভ্যতা যেন মানুষের পৃথিবীকে না গ্রাস করে।

লেখক পরিচয়

মেদিনীপুর জেলার সাউটিয়ায় ১৯২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানে এম.এসসি, পি এইচ ডি, প্রেম চাঁদ বৃত্তি, মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। মেঘনাদ সাহার অধীনে "সাইক্লোট্রন" গবেষণাগারে গবেষণা জীবন শুরু। পরমাণু বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণামুলক বহু মৌলিক প্রবন্ধ দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাস স্পেকট্রোস্কোপিও আইসোটোপ পৃথকীকরণ প্রযুক্তিতে সারফেস ফিজিক্সে, আয়ন ও গ্যাসের সংঘাত ক্রিয়ায় নিউক্লিয় বিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

Advance in Electronics and Electron Physics 161.42 & 79 বইয়ের অন্যতম লেখক।

তাঁর লেখা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য বই হল পদার্থ বিকিরণ বিশ্ব, মহাবিশ্বের কথা, প্রগতি পরিবেশ পরিণাম, ভরের বর্ণালি, কণাত্বরণ, মেঘনাদ সাহা : জীবন ও সাধনা। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু জনপ্রিয় বিজ্ঞান নিবন্ধ লিখেছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচনাবলিতে সৃষ্টির পথ বইটি নতুন সংযোজন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান পুরস্কার ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতিফলক পেয়েছেন। এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৫ সালে।

পাঠ-প্রসঙ্গ

বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের একান্ত প্রয়োজন বায়ু, জল ও খাদ্য। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে যেভাবে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বেড়ে গেছে তাতে বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ বায়ু এমনকী বিশুদ্ধ খাদ্য পাওয়া দুষ্কর। সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশ আজ দূষিত। এই দূষিত পরিবেশ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনের সংকট ডেকে এনেছে। ১৮ শতকে বৃহৎ শিল্প প্রসারণের ফলে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পেনসিলভ্যানিয়ার ডোনোরাতে বায়ু দূষণের ফলে ১৪,০০০ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ২০ জন মারা যায়। জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য আমেরিকায় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট পাশ হয়। নিউক্লিয় রিয়্যাক্টর প্রচলনে তেজস্ক্রিয় দূষণ বেড়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। বিমান, মোটর চলাচল, কয়লাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র, জাহাজ, গাড়ি চালাতে যেভাবে অক্সিজেন নিঃশেষ হচ্ছে তাতে এক সময় পৃথিবীতে অক্সিজেন ভয়াবহ রূপে কমে যেতে পারে। দূষিত বায়ু থেকে শ্বাসঘটিত অসুখ, সর্দিকাশি, ব্রংকাইটিস, গলক্ষত, নিউমোনিয়া, হাপানি, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের অসুখ বেড়ে যায়। এ ছাড়াও উদ্ভিদ জগৎ ও জড় পদার্থের ওপরও দূষিত বায়ুর প্রভাবে ক্ষতি সাধন ঘটে। জল দূষিত হওয়ার কারণগুলো হল পোকামাকড় বিনাশের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ, উদ্ভিদের পুষ্টি যোগাতে সারের ব্যবহার, জাহাজের আবর্জনা। তেলবাহী জাহাজের বর্জ্য পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে যায়। ডিডিটি অ্যানিড্রিন, গ্যামাক্সিন জল দূষণের প্রধান উৎস। তা ছাড়া বিভিন্ন কলকারখানা ও শিল্পে ব্যবহৃত ধাতু বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে নদীতে এসে পড়ে তাদের ভেতর থাকে সীসা। আর্সেনিক ও তামা যা প্রাণীদেহের ক্ষতিকারক। মানুষ উন্নয়নের তাগিদে জলসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশাল বাঁধ ও কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে, যার জন্য পরিবেশ প্রকৃতিগত

সামঞ্জস্য হারায়।

বায়ু ও জল দূষণের মতো মাটিরও দূষণ হয়। বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ স্তূপীকৃত হয়ে জমে মাটি দূষণ করে। মাটিতে দূষণ অনেক দিন জমে থাকতে পারে। নিউক্লিয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও নিউক্লিয় বিস্ফোরণ থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থে মাটি দূষিত হয়। এই তেজস্ক্রিয়ার দূষণ এমন ভয়াবহ যে মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরের ক্ষতি সাধন করে, ক্যান্সার ঘটায়। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেয় এমনকী গর্ভস্থ শিশুরও ক্ষতি করে। ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির ভারসাম্য হারায়। ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ বনাঞ্চলের বিনাশ সাধন ও কৃষিকাজের প্রসার।

শব্দের প্রাবল্য আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে। এ ছাড়াও হৃদস্পন্দন, স্নায়ুতন্ত্র ও ব্লাডপ্রেসারের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে শব্দের প্রাবল্য বেড়েই চলেছে যা আমরা ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। শব্দ দূষণ এড়াতে কম শব্দ উৎপন্ন হওয়ার দিকে নজর রাখতে হবে। শব্দ নিরোধক পদার্থে যন্ত্রপাতি ঢেকে রাখা, শব্দবহুল কারখানার কর্মীদের কানের ঢাকা পরতে হবে।

শব্দদূষণ পুঞ্জীভূত হয়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রদূষণের সমস্যার জন্য ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে আরথ্ সামিট বা বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক নামে বিশাল আকারের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। পদ্ধতি নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও পরিবেশের উন্নতির একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে সবাই একমত।

পাঠের উদ্দেশ

পরিবেশ দূষণ পাঠটিতে দূষিত পরিবেশের ভয়াবহতা আমাদের জীবনকে কীভাবে বিপন্ন করে চলেছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পাঠটি সংকলন করা হয়েছে।

শব্দার্থ

বায়ুমণ্ডল—পৃথিবীর উপরিস্থ যে স্থান পর্যন্ত বায়ু আছে। পোষণ—পালন। তেজস্ক্রিয়—যা থেকে এমন এক ধরনের রশ্মি বিকীর্ণ হয় যা অস্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে দেখা যায়। নিস্তেজ—শক্তিহীন, দুর্বল। ভূগর্ভস্থ—মাটির নীচে অবস্থিত। নিষ্কাশিত—যা বের করা হয়েছে। আস্তরণ—আবরণ। নিয়ন্ত্রণ—পরিচালন। দূষণ—অপবিত্রকরণ। শ্রুতিগোচর—শোনা যায়। অগ্রগতি—উন্নতি। ঢক্কানিনাদ—ঢাকের বাজনার মতো তীব্র আওয়াজ। পুঞ্জীভূত—সঞ্চিত। বিকিরণ—বিস্তার। স্নায়ুতন্ত্র—দেহের মধ্যে অবস্থিত সুতোর মতো সূক্ষ্ম নাড়ীর চলাচল। বসুন্ধরা—পৃথিবী। বৈঠক—সভা। জনস্ফীতি—লোকবৃদ্ধি। মৈক্য—একমত। মতানৈক্য—মতভেদ।

টীকা

আমেরিকা

পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত আমেরিকা একটি মহাদেশ। আমেরিকা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা এই দুই ভাগে বিভক্ত। লাইক এরিকসন নামে একজন আইসল্যাণ্ডবাসী এর প্রকৃত আবিষ্কর্তা। তবে এর আবিষ্কর্তা হিসেবে কলম্বাসের নামই অধিক প্রচলিত। বিশ্বের উন্নত দেশের মধ্যে আমেরিকা অন্যতম।

দূষিত বায়ু

বায়ুর প্রধান উপাদনগুলো হলো নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড। নাইট্রোজেন ৭৮.০৩ শতাংশ, অক্সিজেন

২০.৯৯ শতাংশ, কার্বনডাই অক্সাইড ০.০৩ শতাংশ। এ ছাড়া বাকি অংশে মিথেন ও বিরল গ্যাস থাকে। এই সব উপাদানের মধ্যে কোনোটির অনুপাত যদি বেড়ে যায় বা অন্য কোনো পদার্থ যুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে জীবের পক্ষে অনিষ্টকর হয় তখন সেই বায়ুকে দূষিত বায়ু বলে জানা যায়।

ব্রাজিল

ব্রাজিল নামটি এসেছে 'ব্রাজিলিউড' থেকে। যা একপ্রকার কাঠ উৎপাদনকারী গাছ। সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রী ব্রাজিল সাধারণ ভাবে ব্রাজিল নামে পরিচিত। ব্রাজিলের পর্তুগিজ নাম ব্রাজিউ। এটি দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম রাষ্ট্র। আমেরিকায় পর্তুগিজ-ভাষী এই একটি মাত্র দেশ। এবং বিশ্বের মধ্যে সর্ব-বৃহৎ পর্তুগিজ-ভাষী রাষ্ট্র। ১৮১৫ সালে যুক্তরাজ্য পর্তুগাল আলগ্রেভিজের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গঠন করেছিল।

রাষ্ট্রপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ

রাষ্ট্রসংঘ বা জাতিসংঘ হল বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের সংগঠন। যার লক্ষ হল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন নিরাপত্তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক প্রগতি এবং মানবাধিকার সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৪৫ সালে ৫১ টি রাষ্ট্র সনদে স্বক্ষর করার মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী রাষ্ট্র সংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৩।

প্রশ্নাবলি

১। বহুমুখী প্রশ্ন।

(ক) **বায়ুতে কত শতাংশ অক্সিজেন থাকে?**
(১) ৪০.৯৯ (২) ৩০.৯৯ (৩) ২০.৯৯ (৪) ৫০.৯৯

(খ) **কত শতক থেকে পৃথিবীতে দূষণের মাত্রা বেড়ে গেছে?**
(১) ১৮ শতক (২) ১৯ শতক (৩) ২০ শতক (৪) ২১ শতক।

(গ) **কত বছর আগে ইজিপ্ট প্রথম বাঁধ তৈরি করে?**
(১) দুই হাজার (২) তিন হাজার (৩) চার হাজার (৪) পাঁচ হাজার।

(ঘ) **উড়োজাহাজ কলকাতা থেকে মুম্বাই যেতে কত টন অক্সিজেন খরচ হয়?**
(১) ৭০/৮০ টন (২) ৫০/৬০ টন (৩) ৩০/৪০ টন (৪) ১০/২০ টন।

২. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করো।

(ক) ডি.ডি.টি এক ধরনের কীটনাশক ওষুধ
(খ) বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৭৮.০৩ শতাংশ।
(গ) এক হেক্টর আয়তনের ঘন অরণ্য বছরে প্রায় দু-টন বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মুক্তি দেয়।
(ঘ) পৃথিবীতে দূষণের সমস্যা নিয়ে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়।

৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

(ক) অক্সিজেন বিশুদ্ধ অবস্থায় কোথা থেকে পাওয়া যায়?
(খ) বায়ুর কোন উপাদান উদ্ভিদের পোষণে সাহায্য করে?
(গ) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বায়ুদূষণের ফলে কোথায় ১৪,০০০ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

(ঘ) কত খ্রিস্টাব্দ থেকে নিউক্লিয় রিয়্যাক্টরের প্রচলন হয়?

(ঙ) একটি কীটনাশক দ্রব্যের নাম করো।

(চ) জ্বালানি হিসেবে কয়লার পরিবর্তে কীসের ব্যবহার বেড়ে গেছে?

(ছ) এক ঘনফুট জঞ্জাল কত মাছির জন্ম দিতে পারে?

(জ) ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ কী?

(ঝ) শব্দের তরঙ্গ বিস্তারের একককে কী বলা হয়?

(ঞ) রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের নাম কী?

৪. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) দূষিত বায়ু বলতে কী বোঝ?

(খ) দূষিত বায়ু সম্পর্কে মানুষ কখন সচেতন হয়ে ওঠে?

(গ) দূষিত বায়ু থেকে মানুষের কী কী অসুখ হতে পারে?

(ঘ) উদ্ভিদ জগতে দূষিত বায়ুর প্রভাবে কী ঘটে?

(ঙ) জল কীভাবে দূষিত হয়?

(চ) সাধারণ দূষণ ও তেজস্ক্রিয় দূষণের পার্থক্য উল্লেখ করো?

(ছ) বনাঞ্চল কীভাবে মাটির সুরক্ষা করে?

(জ) শব্দদূষণ এড়াতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন?

(ঝ) শব্দ দূষণের উৎস কী কী? মানবদেহে এর ক্ষতিকারক প্রভাবের উল্লেখ করো।

৫. রচনামূলক উত্তর লেখো।

(ক) পরিবেশ দূষণের কারণগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

(খ) বায়ু কীভাবে দূষিত হচ্ছে এবং এর প্রভাবে প্রাণীজগৎ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ সম্বন্ধে যা জান লেখো।

(গ) দূষিত জলে মানুষের জীবন কীভাবে বিপন্ন হচ্ছে লেখকের অনুসরণে আলোচনা করো।

(ঘ) "স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান নিউক্লিয় যুগের প্রগতি মনুষ্য সমাজে বিপুল সংকটের সৃষ্টি করেছে।"— উদ্ধৃতাংশের যথার্থ আলোচনা করো।

(ঙ) অপস্বর বলতে কী বোঝ? অপস্বর কীভাবে মানুষের ক্ষতি করে লেখো।

(চ) "মানুষের সৃষ্ট সভ্যতা যেন মানুষের পৃথিবীকে গ্রাস না করে।"—সভ্যতা কীভাবে পৃথিবীকে গ্রাস করছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬. টীকা লেখো।

বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক; অপস্বর;

৭. পাঠভিত্তিক ভাষা-ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো।

নির্ভর; পরিচ্ছন্ন দুর্লভ; শতক; যথেষ্ট; তেজস্ক্রিয়।

(খ) বাক্যরচনা করো।

বায়ুমণ্ডল; অস্তিত্ব; নিরাপত্তা; আক্রান্ত; উৎকর্ষ; শ্রুতিগোচর; প্রাবল্য; আলোচনাচক্র; জনস্ফীতি; মতদ্বৈধ।

জন্য ফ্লেমিং এতদিন ধরে নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছিলেন, আজ কোন অদৃশ্য বস্তু এসে অবলীলাক্রমে তার মৃত্যু ঘটাল।

এই ছত্রাকটিই হল পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। এর জীবাণু-ধ্বংসী ক্ষমতা দেখে সারা বিশ্বের লোক অবাক হয়ে গেল। ফ্লেমিং ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ছত্রাক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পেনিসিলিনের ব্যবহার শুরু হয় এর চৌদ্দ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। পেনিসিলিন আবিষ্কারকে অনেকে 'বৈজ্ঞানিক আকস্মিক আবিষ্কারের ঘটনা' বলে চালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মনে রাখতে হবে, ফ্লেমিং তার গবেষণার পাত্র (যেটার মধ্যে সবুজ ছ্যাতলা অর্থাৎ পেনিসিলিন এসে পড়েছিল) ধুয়ে ফেলেননি, শুধু এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন মাত্র। তিনি তাঁর গবেষণা বিষয়ক প্রবন্ধ 'On the Antibacterial action of cultures of penicillin with Special reference to their use in the Isolation of B Influenza' ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রকাশ করেন— তখন অনেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর এই মূল্যবান প্রবন্ধ সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছিলেন।

কক্কাস-জীবাণুর সেই গবেষণা-পাত্র যার উপর পেনিসিলিন ছত্রাক উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল, সেটি তিনি যে ফেলে দেননি তার বোধ হয় আরও একটা কারণ থাকতে পারে। সেটা এখন বলছি।

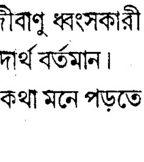
ফ্লেমিং এর আগে লাইসোজাইম আবিষ্কার করেছিলেন। লাইসোজাইম কি তা তোমরা হয়ত জান না। সহজ কথায় লাইসোজাইম হল এক ধরনের বস্তু যা রোগ জীবাণুকে দ্রবীভূত করে শেষ করে দিতে পারে। আমাদের চোখের জলে রয়েছে এই লাইসোজাইম। চোখ হচ্ছে অত্যন্ত কোমল, অনুভূতিশীল ইন্দ্রিয়। বাতাস অথবা ধূলিকণা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ জীবাণু যাতে দেহে প্রবেশ করতে না-পারে সেইজন্য চোখ সর্বদা ভিজা ভিজা অবস্থায় থাকে।

ফ্লেমিং কালচার প্লেট থেকে কিছু রোগ জীবাণু নিয়ে টেস্টটিউবে পরিশ্রুত জলের সঙ্গে মেশাতেন। মিশ্রণটি ঝাঁকালে ঘোলাটে আকার ধারণ করত। এরপর ফ্লেমিং ভাবাবেগশূন্য এক ফোঁটা চোখের জল বের করে ড্রপার দিয়ে ঐ মিশ্রণে ফেললেই তার ঘোলাটে ভাবটা কেটে যেত। ফ্লেমিং বলতেন— অশ্রুর অত্যন্ত শক্তিশালী জীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতা রয়েছে। আমাদের মুখের লালা, নাক ও গলার শ্লেষ্মায়, ঘামে এই ধরনের জীবাণু ধ্বংসকারী পদার্থ বর্তমান।

কক্কাস গবেষণা পাত্রটির উপর সবুজ ছাতাটা দেখে ফ্লেমিং-এর হয়ত অশ্রুর লাইসোজাইম এর কথা মনে পড়তে পারে, কে জানে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ অধ্যাপক ফ্লেমিং-এর ছত্রাক-গবেষণার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর নাম ডা. ফ্লোরি। তিনি ছিলেন প্যাথলজির অধ্যাপক। অক্সফোর্ডের সুসজ্জিত ল্যাবরেটরিতে ডা. ফ্লোরি ও আরও একজন বিজ্ঞানী নিরলস গবেষণা চালিয়ে (গবেষণার টাকা দিয়েছিল ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও আমেরিকার রকফেলার ফাউন্ডেশন) পেনিসিলিয়াম ছত্রাক থেকে তার আসল নির্যাসটুকু বের করে উত্তম পেনিসিলিন তৈরি করলেন যা চমৎকার ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হল। এরও কিছুদিন পরে ল্যাবরেটরিতে সিনথেটিক পেনিসিলিন তৈরি হল, রোগ জীবাণু ধ্বংসের কাজ মানুষের হাতের মুঠোয় এল চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পেনিসিলিন ঔষুধ ধন্বন্তরির ন্যায় কাজ দিয়েছে আহত সৈনিকদের চিকিৎসায়।

লেখক পরিচয়



পার্থসারথি চক্রবর্তী একালের অন্যতম জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। জন্ম ১৮ জানুয়ারি ১৯৪১ কৃষ্ণনগরে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে কৃষ্ণনগর শহরে। পড়াশুনা করেছেন কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে পি. এইচ. ডি পেয়েছেন। প্রথম প্রকাশিত লেখা 'শিশুসাথী' পত্রিকায়। পিতা ননীগোপাল চক্রবর্তীও ছিলেন সুলেখক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

অ্যান্টিবায়োটিক ও পেনিসিলিনের কথা

পার্থসারথি চক্রবর্তী
১৯৪১—

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বর্তমান যুগকে বলা যায় অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। কিন্তু কাকে বলে অ্যান্টিবায়োটিক?

'অ্যান্টি' কথাটির অর্থ হল— বিরুদ্ধে আর 'বায়োটিক' মানে জীবন। অ্যান্টি-বায়োটিক অনুজীবন (Micro-organ-isms) দ্বারা সৃষ্ট। এরা আকারে এত ছোট যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে এদের দেখার কথাই ওঠে না। আমরা যেমন 'কলোনি' গড়ে অনেকে মিলে একসঙ্গে থাকতে চাই, তেমনি এরা নিঃসঙ্গতা এড়িয়ে দলবদ্ধ হয়ে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করে। পাঁউরুটিতে যে ছাতা পড়ে, তা এক রকম অনুজীবের কলোনি।

এই পৃথিবী অনুজীবে পূর্ণ। এমন অনেক অনুজীব আছে যারা নানা ধরনের রোগের কারণ।

কিন্তু আবার নানা রকম অনুজীব পাওয়া যায় যারা নিজেদের শরীর থেকে এমন সব রাসায়নিক জিনিস তৈরি করে যা অন্য ক্ষতিকর অনুজীবদের ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। এই রাসায়নিক পদার্থের নাম অ্যান্টিবায়োটিক। বিজ্ঞানীরা কৌশলে এই সব জীবাণুদের বন্ধ করে মানুষের দেহে যে সব জীবাণু ক্ষতি করে, তাদের ধ্বংসের কাজে এদের লাগান। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, নিওমাইসিন, অরিওমাইসিন, গ্যারামাইসিন, অ্যামপিসিলিন, টেরামাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন— এই সব অ্যান্টিবায়োটিক আজকাল চিকিৎসকেরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

আজকাল অবশ্য পেনিসিলিন থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে 'অ্যামপিসিলিন' তৈরি হয়েছে যা নাকি পেনিসিলিনের থেকে আরো বেশি শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক।

শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে ক্ষতিকর জীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ করে তার উত্তর এখনও সঠিক জানা যায়নি। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা, জীবাণুদের বেড়ে ওঠার জন্য সাধারণত যে-সব খাদ্যের প্রয়োজন হয় অ্যান্টিবায়োটিক সেই খাদ্যের জোগান বন্ধ করে দেয়।

পেনিসিলিনের কথা

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামে এক ধরনের জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। এই স্ট্যাফাইলোকক্কাস হল এক ধরনের দুরন্ত জীবাণু। আমাদের অনেক রোগের কারণও বটে। গবেষণাগারের পেট্রিডিসে (এক ধরনের বিশেষ কাচের প্লেট) ফ্লেমিং এই জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চাল্লাচ্ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন কী করে ঐ রোগ জীবাণুকে নিস্তেজ ও দুর্বল করে দেওয়া যায়।

একদিন ফ্লেমিং-এর গবেষণা পাত্রের উপর বাতাস থেকে কি একটা উড়ে এসে পড়ল। ফ্লেমিং লক্ষ করলেন কক্কাস জীবাণুর উপর সবুজ রংয়ের ছাতা গজিয়েছে। বর্ষাকালে আমাদের জুতোয় যে ধরনের ছ্যাতলা পড়ে, অনেকটা সেই রকম আর-কি।

গবেষণা পাত্রটি না-ফেলে তিনি ওটা টেবিলের এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। কয়েকদিন বাদে ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন আশ্চর্য ব্যাপার, ঐ ছ্যাতলার নীচে দুরন্ত কক্কাস জীবাণুগুলি একেবারে গলে গিয়েছে। যে জীবাণুর দৌরাত্ম্য শেষ করবার

সহ-শিক্ষা অধিকর্তার পদ অলংকৃত করেছিলেন বহুদিন। প্রশাসনে দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ. জি. সি.-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ফেলোশিপ নিয়ে ব্রিটেনের এডিনবরা, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম জর্মানির হামবুর্গ, হাইডেলবার্গ, বার্লিন ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন। কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পুরস্কার (১৯৮৬), শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৮৯) পেয়েছেন।

পাঠ-প্রসঙ্গ

অ্যান্টিবায়োটিক আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের অমূল্য রতন স্বরূপ। এর অবিহনে চিকিৎসা-বিদ্যা প্রায় অচল, তেমনি মানব-স্বাস্থ্যও পঙ্গু। সভ্যতার এই অপরিসীম দানের বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা জেনে উপকৃত হবে। বিজ্ঞান-সম্পর্কে তাদের কৌতূহলও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

শব্দার্থ

কলোনি— বসতি, উপনিবেশ। নিঃসঙ্গতা— একাকীত্ব, সঙ্গীহীনতা। ক্ষতিকর—অকল্যাণকারী। পদ্ধতি—উপায়, রীতি, সূত্র। শক্তিশালী—শক্তিমান, শক্তিধর। নিস্তেজ—তেজহীন, শক্তিহীন। আশ্চর্য—অবাক, চমৎকৃত। দৌরাত্ম্য—বদমায়েসি। নিরলস—আলস্যহীন। প্রয়াস—চেষ্টা, প্রচেষ্টা। অদৃশ্য—যা দেখা যায় না। অবলীলাক্রমে—অনায়াসে, আপনা-আপনি। প্রকৃত—আসল। অনুসন্ধিৎসা—অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা। দ্রবীভূত—গলিয়ে ফেলা। অনুভূতিশীল—অনুভূতিপ্রবণ, অনুভব করতে পারে এমন। পরিশ্রুত—পরিষ্কার, দূষণমুক্ত। আগ্রহ—কৌতূহল। নির্যাস—রস।

টীকা

অ্যান্টিবায়োটিক

রোগজীবাণু ধ্বংসকারী বা সেগুলির প্রজননে বাধাপ্রদানকারী একধরনের প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম পদার্থ। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর রোগ চিকিৎসায় আজকাল অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ব্যাপক। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং একপ্রকার ছত্রাক নিঃসৃত দ্রব্য আবিষ্কার করেন। দ্রব্যটির নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যান্টিবায়োটিক। কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই এটি মানুষের অনেক রোগ সারাতে সক্ষম। এবং পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছত্রাক থেকে জাত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল পেনিসিলিনি।

অনুজীবন

অনুজীবন বা অনুজীব হল একপ্রকার ক্ষুদ্র এককোষী জীব। বহুকোষীও হতে পারে। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। সকল প্রকার ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, এককোষী শৈবাল, ছত্রাক অনুজীবের অন্তর্গত। অ্যান্টোনি লিউয়েনহুক নামক একজন বিজ্ঞানী ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম অনুজীব আবিষ্কার করেন। স্মর্তব্য যে পৃথিবীর প্রথম জীবকোষ অ্যামিবা-ও অনুজীব, যার কেবল একটি মাত্র কোষ ছিল।

পেনিসিলিন

পেনিসিলিয়াম নামক একপ্রকার ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন তৈরি হয়। পেনিসিলিন বিটা ল্যাক্টাম-জাতীয় একপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক। ১৯২৮ সালে স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। পেনিসিলিন

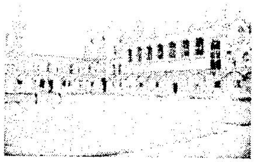
প্রায়ই ব্যবহৃত হয় প্রোকেইন পেনিসিলিন, পেনিসিলিন জি ইত্যাদি রূপে। ১৯৪১ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথম মানুষের দেহে পেনিসিলিন প্রয়োগ করা হয়।

আলোকজান্ডার ফ্লেমিং



স্যার আলোকজাণ্ডার ফ্লেমিঙের জন্ম স্কটল্যাণ্ডের ১৮৮১ সালে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট ম্যারি মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৯০৬ সালে আলমোন রাইট নামক একজন ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর অধীনে গবেষণায় নিযুক্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আর্মি মেডিকেল কর্পের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ফ্লেমিং প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন, সেটা ছিল ১৯২৮ সাল। ১৯৪৫ সালে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৫৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়



ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড শহরে অবস্থিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি ভাষাভাষী জগতে সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বিশ্বের এই অগ্রণী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে। প্রথম দিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞানের পঠনপাঠন ছিল কিন্তু নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। ১৩৫৫ সালে রাজার আদেশ বলে অক্সফোর্ড নগরীতে ভবন নির্মাণের স্থান নির্দিষ্ট হয়। ১৮৮৭ সালে প্রথম মহিলা কলেজ লেডি মার্গারেট হল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৯ টি কলেজ আছে। এ পর্যন্ত ৪৭ জন নোবেল বিজয়ী ও ২৫ জন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং ২৮ জন বিদেশী প্রধান মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন করেছেন।

ড. ফ্লোরি



১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যোসেফ ফ্লোরি এবং মাতা বার্থা ফ্লোরি। মেধাবী ফ্লোরি অ্যাডিলেডের সেন্ট পিটার্স কলেজে পড়াশুনা করেন। এরপর ১৯১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলিডে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজ বিজ্ঞান(মেডিসিন) নিয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৬ সালে তিনি আমেরিকার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি করেন। এবং শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যাথোলজি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন, ১৯৩১ সালে। এরপর ১৯৩৮ সাল নাগাদ তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোলজি বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারে অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বিশ্বের সতেরোটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৪৪ সালে পেয়েছিলেন নাইট উপাধি। ১৯৬৮ সালে এই মহান বিজ্ঞানীর দেহাবসান ঘটে।

রক ফেলার ফাউণ্ডেশন

এটি আমেরিকার একটি বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থা। স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা জে.ডি. রকফেলার ১৯১৪ সাল থেকে এটি চালু করেন। জে.ডি রকফেলার ছিলেন আমেরিকার প্রথম বিলিয়নিয়ার। তিনি ছিলেন বিলোপবাদী।

এবং বিশ্বাস করতেন এই ধন তাঁকে ঈশ্বর দিয়েছেন। নিউইয়র্কের কিংবদন্তী মিউজিয়াম 'মিউজিয়াম অফ আর্ট' রকফেলার ফাউন্ডেশনের আর্থিক সাহায্যে তৈরি।

অনুশীলনা

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানে বর্তমান যুগকে বলা হয়—

১. অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ ২. পেনিসিলিনের যুগ
৩. ভিটামিনের যুগ ৪. থেরাপির যুগ ।

খ. 'অ্যান্টি' কথার অর্থ কী?

১. বিরুদ্ধে ২. সপক্ষে
৩. সগোত্রে ৪. অগোত্রে।

গ. 'বায়োটিক' মানে—

১. বায়ু ২. জীবন
৩. মরণ ৪. জীবাণু।

ঘ. অ্যান্টিবায়োটিক সৃষ্টি হয়—

১. অণুজীবের দ্বারা ২. বায়ুর দ্বারা
৩. জলের দ্বারা ৪. প্রাণীর দ্বারা।

১. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।**

১. কাকে বলে অ্যান্টিবায়োটিক?
২. অণুজীবন কাকে বলে?
৩. অণুজীবনের বৈশিষ্ট্য কী?
৪. অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ কী?
৫. অণুজীবের কাজ কী?
৬. পাঁচটি অ্যান্টিবায়োটিকের নাম লেখো।
৭. পেনিসিলিন থেকে প্রস্তুত অ্যান্টিবায়োটিকের নাম লেখো।
৮. মানব শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে কাজ করে?

২. **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।**

১. অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে সৃষ্টি হয়?
২. বায়োটিক কথার অর্থ কী?
৩. আমাদের রোগের প্রধান কারক কী?
৪. পাউরুটিতে যে ছাতা পড়ে তা কী?
৫. একটি ছত্রাকের নাম লেখো।
৬. পেনিসিলিনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল কবে?

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো।**

১. পাউরুটিতে যে ছাতা পড়ে, তা একরকম ——— কলোনি।

২. এই পৃথিবী ——— পূর্ণ।

৩. অ্যান্টিবায়োটিক ——— দ্বারা সৃষ্ট।

৪. অ্যামপিসিলিন তৈরি ——— থেকে।

৫. লাইসোজাইম রয়েছে আমাদের ———।

৬. ড. ফ্লোরি পেশায় ছিলেন একজন ———।

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।**

১. অণুজীব আমাদের কীভাবে উপকৃত করে?

২. অ্যান্টিবায়োটিক কী?

৩. অণুজীবের উপকারিতা কী?

৪. অ্যামপিসিলিন কী? এটি কী বস্তু থেকে তৈরি হয়?

৫. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং কীসের ওপর গবেষণা করেন? এবং কত সালে?

৬. পেট্রিডিস কী?

৭. পেনিসিলিয়াম নোটেটাম-এর কাজ কী?

৮. কক্কাস জীবাণু ধ্বংসকারী পদার্থটির নাম কী লেখো।

৯. লাইসোজাইম কে আবিষ্কার করেন?

১০. লাইসোজাইম কী?

১১. আমাদে চোখ সব-সময় ভেজা থাকে কেন?

১২. মানব শরীরের কোথায় কোথায় জীবাণু ধ্বংসকারী পদার্থ রয়েছে?

৫. **রচনাধর্মী উত্তর লেখো।**

ক. অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের কাহিনি লেখো।

খ. পেনিসিলিন কী? মানবজীবনে পেনিসিলিনের ভূমিকা বর্ণনা করো।

গ. অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে মানুষের উপকার সাধন করে বিশদ করো।

রামের সুমতি

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮৭৬—১৯৩৮

(এক)

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন্ দিক দিয়া কীভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার যো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারিতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু-দশ ঘর বাগ্‌দি প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন, সে আজ তের বছরের কথা— সেই বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বৎসরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তেরো বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট দু'টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া অ্যারারুট ও ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ির দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে তিন গাঁয়ে যেতে হবে— সেখানে চার টাকা ভিজিট— আসতে পারবে না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? যা তুই, ডেকে আন গে।

এদিকে রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্‌পেন্‌সারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙা আলমারির সামনে একটা ভাঙা টেবিলে বসিয়া নিক্তিহাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি-পাঁচজন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তর নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, আমি কী করব— ওষুধ দিচ্ছি—

ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভালো হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন, নিক্তি সব তুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত বড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্ধা যে সংসারের কোনো মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো, তবে নিতে আসিস কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে আর ডাক্তার নেই, তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না।

লোকগুলো স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্বার বলিল, — তুমি ছোট জাত, বামুনের মান-মর্যাদা জান না, তাই বলে ফেললে, — পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদি মাথায় দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সদ্যই ভেঙে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এসো, দেরি করো না। আজ যদি জ্বর না-ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আম-বাগান করেছ, বেশি বড় হয়নি ত, — ও কুড়ুলের এক-এক ঘায়েই কাত হবে— ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে এই শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিলেন, আমি থানায় দারোগার কাছে যাব, তোমরা সব সাক্ষী। যে-বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী! সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার ত কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁভোঁ করতেছে— রামঠাকুর কী যে বলে গেল, তা শুনতেও পেলুম না। একবার হাতটা দেখ দেখি আপনি— আজ দুখানা রুটি-টুটি খাব নাকি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, সাক্ষী দিবিনে তোরা? তবে দূর হ' এখান থেকে। আমি কারুর হাত দেখতে পারব না, মরে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না— দেখি, তোদের কি গতি হয়।

বৃদ্ধ লাঠিটি হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল— দোষ কারো নয় ডাক্তারবাবু, উনি বড় শয়তান। আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে গিয়ে ওনারে ঠান্ডা করে এসো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা— সংসারের সর্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেলেন,—

নারায়ণী বাহিরের দিকে জানলায় চোখ রাখিয়া ছটফট করিতেছিলেন। রাম বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল— গোবিন্দ, খাঁচা ধরবি আয়।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলনে, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হল?

হাঁ।

কী বললি তাঁকে?

আসতে বললুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না— শুধু আসতে বললি— আর কিছু বলিসনি?

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল না, কী বলেছিস তাঁকে?

বলব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল— ডাক্তারবাবু আসছেন।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটা দল আছে। তাদের যে-কথা, সেই কাজ। তাতেই বড় শঙ্কা হয়, মা! আমরা ওষুধই দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারিনে।

শ্যামলাল রুষ্ট হইয়া বলিলেন, ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতেই তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্বনাশ! আমার ভিজিট ত এক টাকা। তার বেশি কোনোমতেই নিতে পারব না— ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দু'দিনের, কিন্তু ধর্মটা য চিরদিনের।

যাহা হউক নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন, এবং সংসার আবার পূর্বের মতোই চলিতে লাগিল।

(দুই)

মাস-দুই পরে একদিন তিনি নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণকলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, নেত্য, সে বাঁদরটা কোথায়?

বাঁদরটা যে কে, তাহা বাটীর সকলেই জানিত।

নিত্য বলিল, ছোটবাবু, এই ত ছিল— ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরি কচ্চে।

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ইদিকে আয় হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

রামলাল আধখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণী বলিলেন, সাঁতরাদের এক মাচা শসাগাছ কেটে দিয়ে এসেছিস কেন?

তারা আমাকে কাটতে দেখেছে?

তারা দেখেনি, আমি দেখেছি। কেন কেটেছিস বল্?

এতটুকু একটু শসা নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নারায়ণী আরো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হাঁ বাঁদর! এক শ'বার হয়। বুড়ো-ধাড়ি, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটা জানে। দাঁড়িয়ে থাক্ এক-পায়ে, পাজি, দাঁড়া বলচি।

এ বাড়িতে কচি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘণ্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুম মতো এতক্ষণ সে ঘুড়ি ধরিয়া ছিল, গোলমাল শুনিয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া চট করিয়া বলিল, কাকা, দাঁড়াও এক-পায়ে— এমনি করে। বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রণালীটা দেখাইতেছিল—

রাম ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় কষাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া এক-পায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসি চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে তেমনই করিয়া এক-পায়ে দাঁড়াইয়া, কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে।

নারায়ণী বলিলেন, আচ্ছা যা, হয়েছে। আর এমন করিস নে।

রাম সে কথা শুনিল না। রাগ করিয়া তেমনিভাবে এক-পায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল, চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, ইস্কুলের সময় হয়নি ছোটবাবু? মা ডাকছেন।

বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খিড়কির এঁদো-পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন— ওরে ও ভূত! ও কি করলি? ও ডোবাটায় ভয়ে কেউ পা ধোয় না, তুই স্বচ্ছন্দে ডুব দিয়ে এলি?

তিনি আঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আনিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়া-ভাতের সুমুখে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার মনের ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী ভাইটি, এ-বেলা তুই আপনি খা, রাত্তিরে তখন আমি খাইয়ে দেব। চেয়ে দেখ এখনো আমার রান্না শেষ হয়নি— লক্ষ্মীটি খাও!

রাম তখন ভাত খাইয়া জামা পরিয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, তোমার জন্যই ওর সব-রকম বদ অভ্যাস হচ্চে মা! অত বড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া কি! একটু রাগ করলেই খাইয়ে দিতে হবে— ও আবার কি কথা!

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোরা ওর বয়সই দেখিস! বড় হলে, বুদ্ধি হলে ওর আপনিই লজ্জা হবে। তখন আর কোলে বসতে চাইবে, না, খাইয়ে দিতে বলবে?

নেত্য বলিল, ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি-রকম দুষ্টু হয়ে উঠেচে তা ত নিজেও দেখতে পাচ্চ। পাড়ার লোকে বলে, তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী রুক্ষস্বরে বলিলেন, পাড়ার লোকে আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না। কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স, সমস্ত সকালবেলাটা যে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে, পচাপুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান জানেন, জ্বর হবে, না কি হবে, তার পরে কি বলিস উপোস করিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না, নেত্য। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

সকল মানুষকে ভগবান একরকম গড়েন না। ও একটু দুষ্টু বলেই আমি যার তার কথা চুপ করে সহ্য করি, কিন্তু আদর দেবার খোটা লোকে দেয় কী বলে? তারা কী চায়, ওকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি? তা হলেই বোধ করি, তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বলিয়া কোনোরূপ উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না-করিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

দাদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে রাম একেবারে পছন্দ করিত না। আজ রাত্রে ইচ্ছা করিয়াই নারায়ণী দুই ভাইয়ের খাবার পাশাপাশি দিয়া অদূরে বসিয়াছিলেন। রাম ঘরে ঢুকিয়াই লাফাইয়া উঠিল। যাও, আমি খাব না— কিছুতেই খাব না।

নারায়ণী বলিলেন, তবে শুগে যা।

তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রামের লাফানি বন্ধ হইল, কিন্তু, সে খাইতে বসিল না— চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের আর একটা দরজা দিয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিতেই রাম ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল। শ্যামলাল ধীরে-সুস্থে খাইতে বসিয়া বলিলেন, রেমো খেলে না যে?

নারায়ণী সংক্ষেপে বলিলেন, ও আমার সঙ্গে খাবে।

আহার শেষ করিয়া শ্যামলাল চলিয়া যাইবামাত্রই রাম একমুঠা ছাই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি কাউকে খেতে দেব না— সকলের পাতে ছাই দিয়ে দেব— দিই?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, দিয়ে একবার মজা দেখ না!

রাম ছাই-মুঠা হাতে করিয়া সুর বদলাইয়া বলিল, ভারী মজা, সকালবেলা আমাকে ঠকিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়ে এখন মজা দেখ না!

তুই খেলি কেন?

তুমি যে বললে রাত্তিরে—

বুড়ো খোকা, পরের হাতে খেতে তোর লজ্জা করে না?

রাম আশ্চর্য হইয়া বলিল, পরের হাতে কোথায়! তুমি যে বললে!

নারায়ণী আর তর্ক না-করিয়া বলিলেন, লোকের কথা যে আমি আর সহ্য করতে পারিনে।

রাম মুখের ভাত গিলিয়া লইয়া বলিল, কে লোক তার নাম বল।

নারায়ণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, — বাস্! কে লোক, ওকে তার নাম বলে দাও!

কিন্তু মাস-কয়েক পরে সত্যই নারায়ণীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার বিধবা মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা

সুরধুনীকে লইয়া এতদিন কোনোমতে তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইটির মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

আজ সকালবেলা রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশ্বত্থ-চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, ওটা কি হচ্চে রাম?

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বত্থ-গাছটা বড় হলে বেশ ছায়া হবে গো! মাস্টারমশাই বলেছে, অশ্বত্থের ছায়া খুব ভাল। গোবিন্দ, যা, ঘটি করে জল নিয়ে আয়। ভোলা, মোটা দেখে একটা বাঁশ কেটে আন— বেড়া দিতে হবে। নইলে গরুবাছুরে খেয়ে ফেলবে।

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ-গাছ! এমন ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড কখনও বাপের বয়সে দেখিনি বাবা!

তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া, রাম যখন গাছ-পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ তুঁষের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্ নারায়ণি, চেয়ে দেখ্! দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্। উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ-গাছ পুঁতে বলে কিনা ছায়া হবে। আবার ওদিকে চেয়ে দেখ্ ভোলার কাণ্ড। একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুকছে— বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই একরাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া আনিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগলামি, সমস্ত জিনিসটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ-গাছ কি হবে রে?

রাম আশ্চর্য হইয়া বলিল, কি হবে কি বৌদি! কেমন চমৎকার ঠান্ডা ছায়া হবে বল ত, আর এই যে ছোট ডালটি দেখচ, উটি বড় হলে,— এই গোবিন্দ, আঙ্গুল দেখাস নে— বড় হলে গোবিন্দর জন্যে একটা দোলা টাঙ্গিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু করে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে; দে কাটারিখানা, আমার হাতে দে, তুই পারবি নে। খটখট ঠকঠক করিয়া বাঁশ কাটা শুরু হইয়া গেল।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, মা ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, অত বড় গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড়-বাকড় আছে যে ঘড়া ঘড়া জল ঢাললেই বাঁচবে? ও ত কালই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া বলিলেন, শুকুবে না ছাই হবে, ভাল চাস ত উপড়ে ফেলে দে গে!

নারায়াণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বাপরে! তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাকবে না।

নারায়ণী মায়ের বুকের ভিতরটা যেন দর্পণের মতো স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওর এখন বুদ্ধি কি মা! বুদ্ধি থাকলে কি কেউ নিজের বাড়ির উঠানে অশ্বত্থ-গাছ পোঁতে? দুদিন থাক, তার পরে ও আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, ফেলে দেবে। ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।

নারায়ণী কহিলেন, না মা, ও-কাজ করো না, তোমাকে বলচি, ওকে চেন না। আমি ছাড়া ওর বড়ভাইও ছুঁতে সাহস করবে না মা! আজকার দিনটা যাক।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই কাপড় ছাড়্ গে যা।

দুপুরবেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিশের অড় সেলাই করিতেছিলেন, নেত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা, সর্বনাশ হয়েচে! দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে। সে ইস্কুল থেকে এসে কাউকে বাঁচতে দেবে না! নারায়ণী সেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছটি নাই।

বলিলেন, মা, রামের গাছ কী হ'ল?

দিগম্বরী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওই।

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেটি শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই-খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি, আমার গাছ?

নারায়ণী রান্নাঘর-হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বলচি, এদিকে আয়।

না, যাব না। কই আমার গাছ?

এদিকে আয় না, বলচি।

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া, মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, মঙ্গলবারে কি অশ্বত্থ-গাছ পুঁততে আছে রে?

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয়?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হলে বাড়ির বড়বৌ মরে যায় যে!

রাম একমুহূর্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল, যাঃ, মিছে কথা।

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, না রে, মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।

এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড়বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, এ আমিও জানি। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি?

নারায়ণী তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না, আর দোষ নেই। তাঁহার চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ রে রাম, আমি মরে গেলে তুই কি করিস?

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যাঃ— বলতে নেই।

নারায়ণী অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো হলুম মরব না রে?

এবারে রাম পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, তুমি বুড়ো বুঝি? একটি দাঁতও পড়েনি, একটি চুলও পাকেনি।

নারায়ণী বলিলেন, চুল না পাকতেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে মরব। নাইতে যাব, আর ফিরে আসব না।

কেন বৌদি?

তোর জ্বালায়! আমার মাকে তুই দেখতে পারিস নে, দিনরাত ঝগড়া করিস, সেইদিন তোরা টের পাবি, যেদিন আমি আর ফিরব না।

কথাটা রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি আর কিছু বলব না। কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে?

নারায়ণী আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, মুখ লুকালে কি হবে, বল্?

ঠিক এই সময়ে দিগম্বরী দেখা দিলেন। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কাজকর্ম নেই নারাণি! দেওরকে নিয়ে সোহাগ হচ্চে, নিজের ছেলেটা যে ওদিকে সারা হয়ে গেল।

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুটা হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

দিন-চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া 'উঃ আঃ' করিয়া বার-দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল— ঐ ডাইনি-বুড়ির রান্না আমি খাব না, কখ্‌খনো খাব না, ঝালে মুখ জ্বলে গেল, বৌদি— ও-বৌদি—

চিৎকার-শব্দে নারায়ণী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

কি হ'ল রে?

রাম রাগে কাঁদিয়া ফেলিল— আমি কখ্‌খনো খাব না, কখ্‌খোন খাব না— ওকে দূর করে দাও। বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নাই দিলে মা দুটো লঙ্কা। কেউ যখন খায় না, তখন—

চুপ কর্ নারাণি, চুপ কর্। রান্না শিখোতে আসিস নে আমাকে, চুল পাকালুম এই করে, এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে। ধিক্ আমাকে!

নারায়ণী আর কোনো কথা না-বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া নতুন করিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন।

দিগম্বরী দুয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাই রে! কোথায় আছিস, একবার ডেকে নে! আর সহ্য হয় না। যা মুখে আসে, আমাকে তাই বলে গাল দেয় রে! আমি বুড়ি! আমি ডাইনি! আমাকে দূর করে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে-জামাইয়ের ভাত খেতে এসেচি— আমার গলায় দেবার দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শতগুণে ভাল। সুরো, আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করব না।

সুরধুনী কাঁদ-কাঁদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

নারায়ণী বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, না, আটকাস্ নে আমাদের নারাণি, যেতে দে। আমরা অনাহারে গাছতলায় মরব সেও ভাল, কিন্তু তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না।

নারায়ণী হাতজোড় করিয়া কহিলেন, কার ওপর রাগ করে যাচ্চ মা? আমরা কি কোনো অপরাধ করেছি?

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকিসুরে বলিলেন, আমি কচি খুকি নই, নারাণি, সব বুঝি। তোর ইশারা না-থাকলে কি ওর কখনো অত সাহস হয়? আমি ডাইনি! অ্যাঁ, আমাকে দূর করে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ-বালাই— গলগ্রহ! পথ ছাড়্ বলচি।

নারায়ণী মায়ের দুই পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, মা, আজকের মতো মাপ কর। আচ্চা, উনি আসুন, তার পরে যা ইচ্ছে হয় করো। তাহার পর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া লইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

দিগম্বরী মুখ কালি করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন।

দুপুরবেলা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া, এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া তাহার বৌদিদির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া শুইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথাপি আস্তে আস্তে বলিল, খিদে পায় যে!

বৌদিদি কথা কহিলেন না।

সে আর একটু জোর করিয়া বলিল, কী খাব?

নারায়ণী শুইয়া থাকিয়াই বলিলেন, আমি জানিনে, যা এখান থেকে।

না, যাব না— আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, আমাকে জ্বালাতন করিস নে রাম, নেত্য আছে, তাকে বল্ গে।

রাম আর কিছু না-বলিয়া বাইরে আসিয়া নেত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, খেতে দে নেত্য।

নেত্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; এক বাটি দুধ, কিছু মুড়ি ও চার-পাঁচটা নারকেলের নাড়ু আনিয়া দিল।

রাম রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এই বুঝি?

নেত্য বলিল ছোটবাবু, ভাল চাও তা আজ আর হাঙ্গামা করো না। বাবু, না-খেয়ে কাছারি চলে গেছে, মা উপোস করে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে— তোমার অদেষ্টে দুঃখ আছে তা বলে দিচ্চি।

রাম তাহা দেখিয়াই আসিয়াছিল, আর দ্বিরুক্তি না-করিয়া খানিকটা দুধ খাইয়া মুড়ি ও নাড়ু কোঁচড়ে ঢালিয়া লইয়া পুকুরধারে গাছতলায় গিয়া বসিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, বৌদি উপোস করিয়া আছে। কথাটা সে মনে মনে যত রকম করিয়াই আবৃত্তি করিল, ততবারই তাহার মনের মধ্যে ছুঁচ ফুটিল।

রাত্রে শ্যামলাল ভার্যাকে বলিলেন, আমার আর সহ্য হয় না। ওকে নিয়ে আর বাস করা চলে না।

নারায়ণী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কথা বলচ?

রামের কথা। তোমার মা আমাকে চার-পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত বলচেন, রাম ওঁকে নাহক অপমান করচে। আমি পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগ করে ওকে আলাদা করে দেব। আমি আর পারিনে।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, রামকে আলাদা করে দেবে? ও-কথা মুখেও এনো না। ও দুধের ছেলে, বিষয়-আশয় নিয়ে কী করবে শুনি?

শ্যামলাল বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে! আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ও কী করবে, সে ও-ই জানে।

নারায়ণী বলিলেন, ও জানে না, আমি জানি। কিন্তু মা বুঝি তোমাকে চার-পাঁচদিন ধরে ক্রমাগত ওই কথা বলে বেড়াচ্চেন?

শ্যামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি ও-সব জানিনে। মুখে বলিলেন বটে 'জানি না', কিন্তু অন্তরে জানিতেছিলেন। এত বড় সত্যটা না-জানিয়া পথ কোথায়? নারায়ণী কী কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভারী গলায় বলিলেন, দেখ, তেরো বছর বয়সে মেয়েরা যখন পুতুল খেলে বেড়ায়, তখন মা আমার মাথায় এই মস্ত সংসারটা ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে স্বর্গে চলে গেলেন। তিনি দেখচেন, এ ভার আমি বইতে পেরেছি কিনা। রেঁধেছি-বেড়েছি, ছেলে মানুষ করেচি, লোক-লৌকতা, কুটুম্ব, সংসার সমস্তই এই একটা মাথায় বয়ে বয়ে আজ চব্বিশ বছরের আধ-বুড়ো হয়েচি। এখন আমার ঘরকন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে এস, সত্যি বলচি তোমাকে, আমি নদীতে ডুব দিয়ে মরব। তখন আর একটা বিয়ে করে রামকে আলাদা করে দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমনি করে সংসার করো, আমি দেখতেও যাব না, বলতেও যাব না। কিন্তু, এখন নয়।

শ্যামলাল মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করিতেন, আর কথা কহিলেন না। কথাটা এইখানেই সে রাত্রে বন্ধ রহিল। পরদিন নারায়ণী রামকে কাছে বসাইয়া গভীর স্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, রাম, তোর এখানে আর থেকে কাজ নেই ভাই। তুই আলাদা কোথাও আলাদা থাক গে যা— পারবি নে থাকতে?

রাম তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, পারব বৌদি। তুমি, আমি, গোবিন্দ আর ভোলা, কবে যাওয়া হবে বৌদি?

এইবার আমি যেখানে দু'চোখ যায়, চলে যাব।

আমিও সঙ্গে যাব।

তুই কি টের পাবি কখন যাব! আমি লুকিয়ে চলে যাব।

আর গোবিন্দ?

সে তোর কাছে থাকবে, তুই মানুষ করবি।

না, আমি পারব না বৌদি।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তোকে পারতেই হবে।

তখন রাম সমস্ত কথাটা অবিশ্বাস করিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া বলিল, সব মিছে কথা। তুমি কোথাও যাবে না।

মিছে নয়— সত্যি। দেখিস, আমি চলে যাব।

রাম অনুতপ্ত হইয়া বলিল, আর যদি তোমার সব কথা শুনি, তা হলে?

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, তা হলে যাব না। তোকেও আর গোবিন্দকে মানুষ করতে হবে না।

রাম খুশি হইয়া বলিল, আচ্ছা, আজ থেকে তুমি দেখো।

(তিন)

আট-দশ দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। দিগম্বরী যে কটাক্ষ করিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু রাম রাগ করিত না। বৌদিদির সেদিনকার কথা ঠিক বিশ্বাস না-করিলেও, তাহার ভয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভগবান বিরূপ, আবার দুর্ঘটনা ঘটিল। আজ দিগম্বরী তাঁহার পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের সংকল্প করিয়াছিলেন। পিতার প্রেতাত্মা এতদিন ছেলের বাড়িতে চুপ করিয়া ছিল, এখন নাত-জামাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল, অবশ্য স্বপ্নে— তবু তাহাকে সন্তুষ্ট করা চাই ত!

সকালবেলা রাম আঁক কষিতেছিল। ভোলা আসিয়া চুপি চুপি খবর দিয়া গেল, দাঠাকুর, ভগা বাগ্‌দি তোমার কেত্তিক-গণেশকে চাপবার জন্যে জাল এনেছে, দেখবে এসো।

একটু বুঝাইয়া বলি। বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের রুইমাছ ঘাটের কাছে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে-দুটো আদৌ ভয় করিত না। রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্তিক-গণেশ।

ভোলার খবরটা রামকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। সে শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, একবার চেপে মজা দেখুক না— জাল ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

ভোলা কহিল, না দাঠাকুর, আমাদের জাল নয়। ভগা জেলেদের মোটা জাল চেয়ে এনেছে— সে ছিঁড়বে না।

রাম শ্লেট রাখিয়া বলিল, চল ত দেখি।

পুকুরধারে আসিয়া দেখিল, তাহার কার্তিক-গণেশের বিরুদ্ধে সত্যই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলো মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উদ্যত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, হতভাগা, মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকচ!

ভগা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হুকুম দিয়া গিয়াছেন। অন্য মাছ আর পাওয়া গেল না দাঠাকুর।

রাম তাহার হাত হইতে জাল ছিনাইয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা, দূর হ!

ভগা জাল তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাম ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিল। সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিগম্বরী আজ সকাল সকাল আহ্নিক সারিয়া লইতেছিলেন। নেত্য আসিয়া খবর দিল, মাছ পাওয়া গেল না

দিদিমা। ছোটবাবু, ভগা বাগ্‌দিকে মেরেধরে হাঁকিয়ে দিয়েছেন।

এই মাছ দুইটার উপর দিগম্বরীর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল।

কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারি কুটিতেছিলেন। তিনি বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'মা!' শুনিয়াছি সন্তানের মুখে মাতৃ-সম্বোধনের তুলনা নাই। নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্বোধনের আজ বোধ করি তুলনা ছিল না। ঐ এক-অক্ষরের ডাকে দিগম্বরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। কিন্তু নারায়ণীও আর কিছুই বলিতে পারিলে না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চোখ মুছিয়া যেখানে রাম পড়া তৈরি করিতেছিল, সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কঠোর-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা বাগ্‌দিকে মেরেধরে হাঁকিয়ে দিয়েছিস?

রাম চমকাইয়া শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া এক মুহূর্ত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, এবং জবাব দিবার লেশমাত্র চেষ্টা না-করিয়া ওদিকের দরজা দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া ভগা বাগ্‌দিকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাছ ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রুই ঘাড়ে করিয়া ধড়াস করিয়া উঠানের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মাছ দেখিয়া এখন শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ওরে, একে ঘাটে ধরিসনি ত? এ রামের কার্তিক-গণেশ নয় ত?

ভগা এত শীঘ্র এত বড় মাছ আনিতে পরিয়া বাহাদুরি করিয়া বলিল, এজ্ঞে হাঁ মাঠাকরুন, এ ঘেটো রুই— বড় জবর রুই!

দিগম্বরীকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ও মাঠকরুন এনারেই ধত্তে বলে দেছ্‌ল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নৃত্যকালী যদিও রামের উপর খুব সদয় নহে, তবুও মাছ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিগম্বরীকে বলিল, আচ্ছা দিদিমা, পাড়ার লোকে জানে ছোটবাবুর কার্তিক-গণেশের কথা। তুমি কি বলে এ মাছ ধরতে বলে দিলে? দু'তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না?

ভগা চার আনা পয়সার লোভে জাল চাহিয়া আনিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া নগদ আদায়ের আশা ছাড়িয়া জাল লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রয়োজন হইলে, কখন কোন্ স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখবে এস দাঠাকুর, ভগা তোমার কাত্তিককে মেরেছে।

রাম চিবানো বন্ধ করিয়া বলিল, যাঃ—

সত্যি দাঠাকুর। মা হুকুম দিয়ে ধরিয়েছে, এখনো উঠনে পড়ে আছে; দেখবে চল।

রাম ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে! বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা-ছাগলের মতো সে পা ছুঁড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য, কিরূপ দুর্দম, সে বিষয়ে দিগম্বরীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।

দিগম্বরী বলিতে লাগিলেন, এমন কাণ্ড হবে জানলে বামুন খাওয়াবার কথাও তুলতাম না বাবা! ও নিজে কেনই বা হুকুম দিয়ে মাছ ধরালে, কেনই বা এমন ধারা করচে, তা সে ও-ই জানে। আমি ত চুপ করেই ছিলাম। তবু সব দোষ যেন আমারই। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা, এখানে একদণ্ডও থাকতে আর ভরসা হয় না।

একটুখানি চুপ করিয়া রীতিমতো কান্নার সুরে পুনরায় শুরু করিলেন, কপাল আমার এমন করে যদি না-ই পুড়বে, তবে, অমন ভাই বা মরবে কেন, আমাকেই বা লাথি-ঝাঁটা খেয়ে থাকতে হবে কেন? বাবা, আমরা নিতান্ত নিরুপায়, তাই হাতজোড় করে বলচি, আমাদের একটা-কিছু উপায় তোমাকে করে দিতে হবেই।

শ্যামলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু হাঁ না কিছুই বলিতে পারিলেন না।

নারায়ণী আড়ালে দাঁড়াইয়া নিজের মায়ের এই নির্লজ্জ ঠকামোর লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রামের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন, লক্ষ্মী মানিক আমার! দোরটা একবার খুলে দে!

রাম জাগিয়া ছিল, সাড়া দিল না।

নারায়ণী আবার ডাকিলেন, ওঠ্, দোর খোল্।

এবারে চেঁচাইয়া বলিল, না খুলব না, তুমি যাও। তোমরা সবাই আমার শত্তুর।

আচ্ছা তাই, তুই দোর খোল্।

তাহার পর দু-তিন দিন কাটিয়া গেলেও যখন রামের রাগ পড়িতে চাহিল না, তখন নারায়ণী ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আজ সন্ধ্যা হয় তবুও সে ইস্কুল হইতে ফিরিল না দেখিয়া নারায়ণী উৎকণ্ঠিত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, এমন সময় দিগম্বরী নদী হইতে গা ধুইয়া উঠানে পা দিয়াই উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তোর গুণধর দেওরের কাণ্ড শুনেছিস নারাণি?

নারায়ণী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিলেন, কী কাণ্ড?

দিগম্বরী বলিলেন, তারা থানায় গেছে। যাবেই ত। যে বজ্জাত ছেলে বাবা, এমনটি সাত-জন্মে দেখিনি! এখন জেলে যান!

তাঁহার মুখে-চোখে আহ্লাদ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। নারায়ণী সে কথার জবাব না-দিয়া ডাকিলেন, নেত্য, রাম এখনো এলো না কেন, একবার ভোলাকে পাঠিয়ে দে, — খুঁজে আনুক।

দিগম্বরী বলিলেন, আমি যে সমস্তই শুনে এলুম।

নেত্য শুনিবার আগ্রহে হাঁ করিয়া দাঁড়াইল, নারায়ণী তাড়া দিয়া উঠিলেন, দাঁড়িয়ে থাকলি যে? কথা কানে গেল না বুঝি!

নেত্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, দিগম্বরী কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কী হয়েচে জানিস নারাণি—

তুমি ভিজে কাপড় ছাড় গে মা, তার পরেই না হয় বলো, বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। দিগম্বরী অবাক হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাস্ রে! মেয়ের রাগ দেখ! এমন একটা কাণ্ড আনুপূর্বিক বলিতে না পাইয়া তাঁহার পেট ফুলিতে লাগিল।

সে কাণ্ডটা সংক্ষেপে এই, —গ্রামের স্কুলে জমিদারদের একটি ছেলে পড়িত। আজ টিফিনের সময় তাহার সহিত রামের তর্ক বাধিল। বিষয়টা জটিল, তাই মীমাংসা না হইয়া মারামারি হইয়া গেল। জমিদারদের ছেলে বলিয়াছিল, শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্মশানকালী রক্ষাকালীর চেয়ে অধিক জাগ্রত। কেননা, শ্মশানকালীর জিভ বড়!

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, শ্মাশানকালীর জিভ একটু চওড়া বটে, কিন্তু অত বড়ও নয়, অমন রাঙাও নয়। কিছুদিন পূর্বে পাড়ায় চাঁদা করিয়া রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছিল, সে স্মৃতি রামের মনে উজ্জ্বল ছিল। জমিদারদের ছেলে রামের কথা অস্বীকার করিয়া নিজের করতল তুলিয়া ধরিয়া, বলিল, রক্ষাকালীর জিভ ত এতটুকু!

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কি, অতটুকু? কখ্খনো না। এই এত বড়। অতটুকু জিভ হলে কী কখনো পৃথিবী রক্ষা করতে পারে? পৃথিবী রক্ষে করে বলেই ত রক্ষাকালী নাম।

তার পর আর দুই-একটা কথা, এবং তার পরই ঘুষাঘুষি। জমিদারদের ছেলের গায়ে জোর ছিল কম, সুতরাং মার সে-ই বেশি খাইল। নাক দিয়াও ফোঁটা-দুই রক্ত বাহির হইল। এই ক্ষুদ্র স্কুলের জীবনে এত বড় কাণ্ড ইতিপূর্বে

ঘটে নাই। যে জমিদারের স্কুল, তাহারই পুত্রের নাকে রক্ত! অতএব হেডমাস্টার নিজে স্কুল বন্ধ করিয়া ছেলেটিকে লইয়া দরবার করিতে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য, রামলাল বহু পূর্বেই অন্তর্ধান হইয়াছিল।

ভোলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দাঠাকুরকে পাওয়া গেল না। অনতিকাল পরে শ্যামলাল মুখ কালি করিয়া বাড় আসিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওগো শুনচ? এ গ্রাম থেকে বাস উঠাতে হল দেখচি! চাকরি করে দু'পয়সা ঘরে আনছিলুম, তাও বোধ করি এবার ঘুচল। নারায়ণী ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া একটা চৌকাঠে ভর দিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরা থানায় গেছেন, না?

শ্যামলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, বাবু শিবতুল্য লোক, তাই মাপ করেচেন, কিন্তু আরো পাঁচজন আছে ত? দিন দিন একটা নতুন ফ্যাসাদ তৈরি হলে কি করে গ্রামে বাস করি, বল! রাম কৈ?

নারায়ণী বলিলেন, সে এখনো আসেনি। বোধ করি, ভয়ে পালিয়েছে।

শ্যামলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালালেও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই, না পালালেও নেই।

দিগম্বরী মনে মনে পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, নারাণি কেন যে ওকে শাসন করতে যায়, — আমার ত দেখে ভয়ে বুক কাঁপে। যে গোঁয়ার ছেলে, ও আমাকেই যখন অপমান করে, তখন ওকে অপমান করে ফেলবে, এ কি বেশি কথা! আমি বলি, মন! নিজের মান নিজের ঠাঁই— রামের কথায় থেকো না।

ঘণ্টা-খানেক পর নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবু ঘরে এসেছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া, রামের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিলেন। রাম খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল, দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বৌদিদি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ঘরের কোণে তাহারই একগাছা পাতলা বেতের ছড়ি ছিল, তাহাই তুলিয়া লইতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া খাটের ওধারে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী ডাকিলেন, এদিকে আয়।

রাম হাতজোড় করিয়া বলিল, আর করব না বৌদি। এইবারটি ছেড়ে দাও।

নারায়ণী কঠিন হইয়া বলিলেন, এলে কম মারব, কিন্তু না এলে এই বেত তোমার পিঠে ভাঙব।

রাম তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া মিনতি করিতে লাগিল, তিন সত্যি করছি বৌদি, আর কোনো দিন করব না, কান মল্‌ছি বৌদি—

নারায়ণী খাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সপাৎ করিয়া এক ঘা বেত তাহার ঘাড়ের উপর বসাইয়া দিলেন; তাহার পর বেতের উপর বেত পড়িতে লাগিল।

শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, কি হচ্ছে ও— সারারাত ঠেঙাবে নাকি?

নারায়ণী বেত ফেলিয়া বলিলেন, মনে থাকে যেন!

চার

রাম ভাত খাইতে বসিয়াছিল। দিগম্বরী আড়ালে বসিয়া সুর তুলিয়া বলিলেন, অত বড় ছেলেকে অমন করে মারা কেন? ওর বড়ভাই কোনদিন গায়ে হাত তোলে না।

নেত্য কাজ করিতে করিতে বলিল, তুমি কম নও, দিদিমা! তুমিই ত ও-সব কথা মাকে এসে লাগাও।

সে রাত্রে অত মার তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই; রাম শুনিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, ডাইনি বুড়ি আমাদের সব খেতে এসেছে!

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, নারাণি শুনে যা তোর দেওরের কথা।

রাম কোনোদিনই তাঁহার কথা সহিতে পারিত না। বিশেষ, এইমাত্র নেত্যর কাছে মার খাইবার কারণ জানিতে পারিয়া, রাগে ফুলিতেছিল, গাছের উপর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বেশ করচি— বুড়ি!

এই বিশেষণটা দিগম্বরী সবচেয়ে অপছন্দ করিতেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, বুড়ি! বেশ কচ্চ? আচ্ছা,

আসুক সে। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হওয়া চাই ত! কি বেহায়া ছেলে বাবা! —মার খেয়ে পিঠের চামড়া উঠে **গেল, তবু** লজ্জা হল না!

রাম উপর হইতে বলিল, ডাইনি বুড়ি!

ডাইনি বুড়ি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

ঠিক এই সময় নারায়ণী ঘাট হইতে আসিয়া পড়িলেন। গাছের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন, ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলিনে? গাছে চড়েছিস যে!

দিগম্বরী মেয়ের গলা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,— ছোঁড়া আমার বাপ তোলে! বলে, নাবব কেন—তোমার বাপের গাছ।

রাম আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হাতে একটা বড় কাঁচা পিয়ারা ছিল— ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া দিল। সেটা দিগম্বরীকে স্পর্শ করিল না, নারায়ণীর ডান ভ্রূর উপরে গিয়া সজোরে আঘাত করিল। এক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখিয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। দিগম্বরী ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি করিয়া উঠিলেন, নেত্য কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, রাম গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারিল।

দুপুরবেলা শ্যামলাল স্নানাহার করিতে আসিয়া দেখিলেন বিষম কাণ্ড! নারায়ণী নির্জীবের মতো বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার ডান চোখ ফুলিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে।

কাছে আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কঠিনভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, আজ তোমাকে আমি দিব্যি দিচ্ছি—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোনোদিন কথা কও— যদি কোনো কথায় থাক, সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, চুপ কর, চুপ কর— ও-কথা মুখে এনো না।

শ্যামলাল বলিলেন, আমার এত বড় দিব্যি যদি না মানো, সেই দিনে যেন তোমাকে আমার মরা-মুখ দেখতে হয়। বলিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে বেড়াইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, অসম্ভব কল্পনা করিয়া রাম সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ি ঢুকিল। দেখিল, উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়িটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। নাড়া দিয়া দেখিল, বেশ শক্ত, ভাঙা যায় না। রান্নাঘরে আলো জ্বলিতেছিল, চুপি চুপি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেখানেও ওই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরে কেহ নাই, শুধু একরাশ পিতল-কাঁসার বাসন মেজের উপর পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা যে কি, তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, সকালবেলার কাণ্ডটার সহিত কেমন করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বৌদি খাটের উপর শুইয়া আছেন, এবং নীচে মাদুর পাতিয়া দিগম্বরী ছোট মেয়েটিকে লইয়া বসিয়া আছেন। গোবিন্দ খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিয়া দিল, কাকা, তোমার বাড়ি ওদিকে, এদিকে আমাদের বাড়ি। বাবা বলেচে, তুমি এ-ঘরে ঢুকলে পা ভেঙে দেবে।

রাম খাটের উপর নারায়ণীর পায়ের কাছে গিয়া বসিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। রাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিগম্বরী তাঁহার ছোট মেয়েকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, সুরো, বল না তোর দাদাবাবু কি বলেছে ওকে।

সুরধুনী বলিল, দাদাবাবু দিব্যি দিয়েচেন দিদিকে,—খেতেও দেবে না, কথাও বলবে না— বললে দাদাবাবু—। নারায়ণী বিছানার উপর হইতে ধমক দিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, হয়েচে হয়েচে, তুই চুপ কর্।

তখন দিগম্বরী বলিলেন, তা সত্যি বাছা! তুমি মানুষ-জনকে আধ-খুন করে ফেলবে — সে দিব্যি না-দিয়ে আর করে কি!

রাম তখনও বসিয়া আছে; এমন অবস্থায় ঘরে-দোরে আগুন ধরিয়া গেলেও ত তিনি উঠিতে পারেন না। রামের বুকের ভিতর চাপা কান্না মাথা খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু দিগম্বরীর সেই সকালবেলার খোনা কথার ভ্যাংচানি তাহার বুকের উপর পাথর চাপাইয়া পথ আটকাইয়া রাখিল। একবার সে কাঁদিতে পারিল না, একবার বলিতে পারিল না, 'আর

করব না বৌদি!' এই একটা কথা অনেক আপদে-বিপদেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে— আজ তাহাই বলিতে না-পাইয়া তাহার দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময়ে নারায়ণী ক্লান্তভাবে বলিলেন, সুরো, যেতে বল্ ওকে।

এবার সে কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল,—যেতে বল্ ওকে! আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি! সেই ত কখন খেয়েচি!

নারায়ণী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, একেবারে খুন করে ফেলেত পারেনি? তা হলে দশহাতে খেতো! আমি জানিনে— যাক ও নেত্যর কাছে।

যাব না নেত্যর কাছে! আমি কারো কাছে যাব না— আমি না-খেয়ে উপোস করে শুয়ে থাকব। বলিতে বলিতে রাম দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া বাড়িঘর কাঁপাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইল। নেত্য কিছু খাবার আনিয়া বলিল, ছোটবাবু ওঠ, খাও।

রাম লাফাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল, দুর হ, পোড়ারমুখী— দূর হ!

নেত্য খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল, রাম থালা-গেলাস ঝনঝন করিয়া উঠানের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সকালবেলা শ্যামলাল কাজে চলিয়া যাইবার পরে, রাম নিজের উঠানে পায়চারি করিতে করিতে গর্জাইতে লাগিল— আমি দিব্যি মানিনে! ওঃ ভারী দিব্যি! ও কে যে, দিব্যি দেয়? ও কি আমার আপনার দাদা? ও কেউ নয়, ওর কথা আমি মানিনে। আমি কি ওকে মেরেচি? বুড়ি ডাইনিকে মেরেছি। ও ত শুধু বৌদিকে লেগেছে, তবে ওরা কেন দিব্যি দিতে আসে!

এ-সকল কথার কেহই জবাব দিল না, খানিক পরে সে সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিল— বেশ ত! ভালই ত! না-ই কথা কইলে, না-ই খেতে দিলে। আমি মজা করে রাঁধব— ভাত, ডাল, ভাল ভাল তরকারি, মাছ— একলা বেশ পেট ভরে খাব। আমার কী হবে?

নারায়ণী রান্নাঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। দিগম্বরী কৌতূহলী হইয়া মাঝে মাঝে বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলেন। খানিক পরে বড় মেয়ের কাছে উঠিয়া আসিয়া হাসি চাপিয়া ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা, বাছার কি বুদ্ধি! উনি আবার ভাল তরকারি রেঁধে খাবেন। একটা পেতলের হাঁড়িতে প্রায় এক কাঠা চাল গলায় গলায় তুলে দিয়ে রান্না চড়িয়েচে— তাতে জল দিয়েছে এক ফোঁটা। একজন খাবে ত, রাঁধছে দশজনের, তাই বা সেদ্ধ হবে কি করে? পুড়ে আঙরা উঠবে যে! ঐ হাঁড়িতে কি অত চাল ধরে, না ঐটুকু জলের কর্ম! আবার রাঁধিয়ে বলে দেমাক আছে! রাঁধি বটে আমরা, কিন্তু দেমাক কত্তে জানিনে! ভাত রাঁধব, তা এমন জল দেব, আর দেখতে হবে না— চোখ বুজে সেদ্ধ হবে! কৈ রাঁধুক দিকি আমার সঙ্গে! লোকে খেয়ে কারটা ভাল বলে দেখি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

নেত্য কাছে ছিল, সে বলিল, দিদিমার এক কথা। ও কি কোনোদিন এক ঘটি জল গড়িয়ে খেয়েছে যে, আজ রেঁধে খাবে?

সে অনেক দিনের দাসী, এ-সব ব্যাপার তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

মায়ের দেখাদেখি সুরধুনীও মাঝে মাঝে গিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। ঘণ্টাখানেক পরে ছুটিয়া আসিয়া দিদির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল— ও দিদি, দেখবে এস— রামদাদা— মাগো! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো শুধু খাচ্চে। কিচ্ছু, নেই দিদি— একেবারে শুধু ভাত, আচ্ছা দিদি, কাঁচা ভাতে পেট কামড়াবে না?

নারায়ণী তাহার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে যে কত দুঃখে কত বড় ক্ষুধার তাড়নে এইগুলা খাইতে বসিয়াছে, সে কথা তাঁহার অগোচর রহিল না।

দুপুরবেলা শ্যামলালের খাওয়া হইয়া গেলে, দিগম্বরী ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, যা পারিস, দুটি খেয়ে নে নারাণি! ওর তাড়সে জ্বরের মত হয়েচে,— ওতে খাওয়া চলে। আমি বলচি, ক্ষেতি হবে না।

নারায়ণী মোটা চাদরটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ভাল করিয়া শুইয়া বলিলেন, আমাকে বিরক্ত করো না মা,

তোমরা খাও গে।

দিগম্বরী বলিলেন, ভাত না খাস, দু'খানা রুটি করে দি— না হয়—

নারায়ণী কহিলেন, না, কিচ্ছু না।

দিগম্বরী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ও আবার কী কথা? কাল থেকে উপোস করে আছিস, আজ দুটি না খেলে হবে কেন?

নারায়ণী জবাব দিলেন না। নেত্য আসিয়া বলিল, তুমি মিথ্যে বকে মরচ দিদিমা। ঐখানে দাঁড়িয়ে একবেলা চেঁচালেও ওঁকে খাওয়াতে পারবে না। জ্বর হয়েছে, একটু ঘুমোতে দাও।

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন, বলিতে বলিতে গেলেন, জানিনে বাপু, নাগ্‌লে-টাগ্‌লে একটু জ্বরভাব হয়, তাই বলে কি মানুষ উপোস করে পড়ে থাকে? আমরা তা পারিনে।

বৈকালে নারায়ণী রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন, এবং যতবার নেত্যর চোখে চোখে হইল, ততবারই কী কথা বলিতে গিয়া যেন চাপিয়া গেলেন।

রাম স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া আনিল। খাইতে খাইতে গলা বড় করিয়া বলিল, কি আর ক্ষেতি হল আমার? ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলুম, আবার ফিরে এসে কেমন খাচ্চি।

বেড়ার ওদিকে সকলেই রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু সকালের মতো এখনও কেহ জবাব দেয় না দেখিয়া সে আরও অস্থির হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, এই দিকটা আমার সীমানা। কোনোদিন নেত্য কি কেউ যদি আমার সীমানায় আসে, তখন পা ভেঙে দেব।

এই পা-ভাঙার ভয় সে ইতিপূর্বেও দেখাইয়াছিল, সেবারেও যেমন ফল হয় নাই, এবারেও হইল না। কেহ ভয় পাইয়াছে কিনা, বোঝা গেল না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবার চেঁচামেচি করিতে লাগিল, আমার কাঠ কই, আমি রাঁধব কি দিয়ে। আমার শিলনোড়া কই, আমি বাটনা বাটব কীসে? ও-ঘর হইতে নেত্য বলিল, মা বলেচেন, কাল শিলনোড়া কিনে দেবেন।

না, আমি কেনা শিলনোড়া চাইনে। বলিয়া সে কাঁদিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন আমার গণেশকে ধরালে? কেন, আমাকে খোনা খোনা করে ও বুড়ি ভেঙালে, বেশ করেচি গাল দিয়েচি— ও মরে আর জন্মে পেত্নি হবে।

দিগম্বরী চোখ কটমট করিয়া বলিলেন, শুনলি নারাণি, শুনলি! এ-সমস্ত পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করা নয়?

নারায়ণী চুপ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া ছিলেন, সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

(পাঁচ)

পরদিন সকাল হইতেই রামের কথাবার্তা বদলাইয়া গেল। সম্পূর্ণ দুইটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, বৌদিদি ডাকে নাই, বকে নাই, খাইতে দেয় নাই, এরকম সে তাহার জ্ঞানে দেখে নাই। আজ সে বাস্তবিক ভয় পাইয়াছিল। প্রথমটা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে নানারূপ উলটা-পালটা জবাবদিহি করিল। ও-ধারের কেহ জবাব দিল না, প্রতিবাদ করিল না, হাঁ না একটা কথাও বলিল না। একবার বহু কষ্টে লজ্জা-সংকোচ ত্যাগ করিয়া 'আর কোনোদিন করব না' বলিয়া ফেলিয়াও যখন ফল হইল না, তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কী উপায়ে কি দিয়া কেমন করিয়া সে বৌদিকে প্রসন্ন করিবে? বৌদিরা তাহাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে, তবে কোথায় সে খাইবে? কাহার কাছে কেমন করিয়া সে থাকিবে? কোনো দিকেই আজ সে কুল-কিনারা দেখিতে পাইল না। আজ সে রাঁধিবার চেষ্টাও করিল না, পড়িতে গেল না, ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল।

গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বোধ করি, গত রাত্রে নারায়ণীর জ্বর আসিয়াছিল। দুপুরবেলা দিগম্বরী এক বাটি দুধ আনিয়া বলিলেন, খেতেই হবে। না-খেয়ে কি মরবি? নারায়ণী প্রতিবাদ না-করিয়া দুধের বাটি হাতে লইয়া কতকটা

খাইয়া বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া [illegible] শ ফিরিয়া [illegible] রিয়া কথা কাটাকাটি করিতে ঘৃণা বোধ হইল।

রাত্রি যখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা ছোটবাবুর ত কোনো সাড়াশব্দ পাইনে— রাত ত ঢের হল!

নারায়ণী উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার, দেখে আয়, সে ঘরে আছে কিনা।

নেত্যর চোখ ভিজিয়া উঠিল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার যেতে সাহস হয় না মা! বলিয়া বাহিরে গিয়া ভোলাকে সে ডাকিয়া আনিল। ভোলা সংবাদ দিল— দাঠাকুর ঘরে আছে, ঘুমুচ্ছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাত না হইতেই তিনি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন।

রান্না যখন প্রায় অর্ধেক অগ্রসর হইয়াছে, তখন দিগম্বরী গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কর্কশ-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোর না জ্বর নারাণি? তুই না তিন দিন খাসনি? ভোরবেলা উঠে চান করে এসে এ-সব কি হচ্ছে, জিজ্ঞেস করি?

নারায়ণী স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, রাঁধছি, দেখতে ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি, কিন্তু কেন? কেন শুনি? তুই কি আমার হাতে খাবিনি?

নারায়ণী জবাব দিলেন না, কাজ করিতে লাগিলেন।

কাল সমস্ত দিন ধরিয়া রাম এই একটা কথা ভাবিতেছিল— বৌদিদির না জানি কত লাগিয়াছে। একটা কাঁচা পিয়ারা লইয়া বার বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এই কুকর্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্বে বৌদি তাহাকে এখানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শেষ স্থির করিল, সে আর কোথাও চলিয়া গেলে বৌদি খুশি হইবে। তাহার মামার বাড়ি তারকেশ্বরের ওদিকে, অথচ কোথায়, সে ঠিক জানে না। সেইখানে গিয়া খুঁজিয়া লইবে সংকল্প করিয়া সে একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া প্রভাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী রান্না শেষ করিয়া একখানি থালায় সমস্ত দ্রব্য পরিপাটি করিয়া সাজাইতেছিলেন। দ্বারের কাছে ভোলা আসিয়া ডাকিল, মা!

নারায়ণী ফিরিয়া ভোলাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে ভোলা?

এ কয়টা দিন সে বাহিরে গরুর সেবা করিত বটে, কিন্তু রামের ভয়ে ভিতরে আসিত না। ভোলা আস্তে আস্তে বলিল, চুপি চুপি একটা কথা আছে মা।

নারায়ণী কাছে আসিতেই ভোলা ফিসফিস করিয়া বলিল, তুমি যা বলেছিলে মা, তাই হয়, যদি দুটি টাকা দাও।

নারায়ণী বুঝিতে না-পারিয়া বলিলেন, কী হয় রে? কাকে টাকা দিতে হবে?

ভোলা একটুখানি আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি দাঠাকুরকে চলে যেতে বলেছিলে না! তিনি যেতে রাজি আছেন— আচ্ছা, দুটো না দাও, একটি টাকা দাও।

নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজি আছে রে? কোথায় সে?

ভোলা বলিল, বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন! বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ি আছে যে!

যা ভোলা, শিগগির ডেকে আন— বল, আমি ডাকচি।

ভোলা ছুটিয়া গেল, নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনতিকাল পরেই রাম একটি ছোট পুঁটুলি হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নারায়ণী নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন।

দূর হইতে দিগম্বরী রামকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সাজানো থালার সুমুখে নারায়ণীর কোলের উপর বসিয়া রাম বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছে, এবং তাহার মাথায়

উপর, পিঠের উপর, আর একজনের অশ্রু বৃষ্টির ধারার মতো ঝরিয়া পড়িতেছে। অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, ওঃ— তাই এত রান্না! খাওয়ান হবে বুঝি! আমার জামাই যে এত বড় দিব্যিটা দিলেন, সে ভেসে গেল বুঝি?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, ভেসে যাবে কেন মা, তাঁর কথা আমি অমান্য করিনি, তিন দিন খাইনি, খেতেও দিইনি।

দিগম্বরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, এই বুঝি? অমান্য করিসনি, তবে এ কী হচ্চে? যে দিব্যি দিয়েচে তার বুঝি হুকুমটাও একবার নিতে হবে না?

নারায়ণী কি যেন একটা কঠিন আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, আমার হুকুম নেওয়া হয়েছে।

দিগম্বরী বিশ্বাস করিলেন না। অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি কচি খুকি নই নারাণি। হুকুম নিলি, আর আমি জানতেও পারলুম না?

এবার নারায়ণীর আর সহ্য হইল না। তিনিও কঠিন হইয়া বলিলেন, তুমি কি জানবে মা, কার কাছে কখন আমি হুকুম পেয়েচি? মা, যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু— বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বুকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বুকে করে এতটুকুকে বড় করে তুলতে হয়, সে-ই জানে, হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে। তোমাকে ভাবতে হবে না মা; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। ও আমার তিন দিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দিগম্বরী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, এখানে তবে আর আমার কী করে থাকা হবে? এ বাড়িতে আর থাকতে পারব না, তা তোকে আজ স্পষ্ট বললুম।

নারায়ণী বলিলেন, আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারছিলুম না, মা, সত্যিই তোমার এখানে থাকা হবে না। তোমার চোখে চোখে আমার এত বড় ছেলে যেন আধখানা হয়ে গেছে। ও দুষ্ট হোক যা হোক, আমার বাড়িতে আমার চোখের সামনে ওকে শাস্তি দিতে আমি কাউকে দেব না। আজ তুমি থাক, কাল কিন্তু বাড়ি যেয়ো। তোমার খরচপত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।

দিগম্বরী কাঠ হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রাম বুকের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বলিল, না বৌদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হয়েছি, আমার সুমতি হয়েছে— আর একটিবার তুমি দেখো।

নারায়ণী আর একবার তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই এখন ভাত খা।

(সংক্ষেপিত)

লেখক পরিচিতি


শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক শরৎ চন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সমাজের অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ, মানবিক সত্যকে স্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা, তাঁর উপন্যাস ও গল্পকে প্রাণময় করে তুলেছে। সাহিত্য জগতে তিনি 'কথাশিল্পী' নামে খ্যাত। সন্ধানি দৃষ্টি নিয়ে সমাজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে প্রকৃত সমস্যা তুলে ধরেছেন। চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গি, সাবলীল ভাষা এবং সার্থক বাস্তবানুগ সংলাপ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচিত 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন',

'গৃহদাহ', 'পল্লীসমাজ', 'পথের দাবী' ইত্যাদি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে। 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি তাঁর উৎকৃষ্ট গল্প। 'মন্দির' নামক প্রথম গল্প রচনা করে 'কুন্তলীন পুরস্কার' বিজয়ী শরৎ চন্দ্র বাঙালির হৃদয়-আসন দখল করে আছেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জানুয়ারি তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

পাঠটির উদ্দেশ্য

জগতে স্নেহ, মায়া-মমতার তীব্র আকর্ষণ অনস্বীকার্য। এই আকর্ষণের বাঁধ ভাঙা ঝরনা মুহূর্তে সব রাগ, জেদ, অভিমানকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঈপ্সিত ব্যক্তির স্নেহধন্য হয়ে একান্ত ব্যক্তিগত প্রিয় জিনিসের প্রতি মোহও অবলীলায় ত্যাগ করা সম্ভব। স্নেহ, প্রেম, দয়া, ভক্তি মানবিক এই কোমল প্রবৃত্তিগুলো সম্বন্ধে, ছাত্রছাত্রীদের সম্যক উপলব্ধি জন্মাবার উদ্দেশ্যে 'রামের সুমতি' পাঠটি সংকলন করা হয়েছে।

টীকা

কুইনিন

কুইনিন ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত এক প্রকার ওষুধ। সিনকোনা বৃক্ষের রস থেকে কুইনিন প্রস্তুত হয়। একটি হিসেব থেকে জানা যায় ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর ২৫০০০ সিনকোনা উদ্ভিদ নষ্ট করে ফেলা হত। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে দুজন ফরাসি বিজ্ঞানী জে বি কেভেনতু এবং পি .জে পিলেতিয়ের সিনকোনা উদ্ভিদের বাকল পরিশুদ্ধ করে কুইনিন প্রস্তুত করেন, যা ম্যালেরিয়া রোগের বিনাশে সক্ষম। এ জন্য প্যারিসে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে ওই বিজ্ঞানীদের স্মৃতিতে।

এরপর ১৮৬৫ সালে ডাচ সরকার এক পাউন্ড চোরাই বীজ কিনে জাভা দ্বীপে ১২০০০ গাছ লাগায়। এভাবে তারা ১১ বছর একচেটিয়া ব্যবসা করে। এবং কালক্রমে তা পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রসার লাভ করে।

শব্দার্থ

বৈমাত্র— বিমাতার গর্ভজাত।
ডাগর— বড়।
ঘড়া— কলসি।
পাঁজি— পঞ্জিকা।
ক্ষুণ্ণ— ক্ষুব্ধ।
আনুনাসিক— নাকি সুর।
আহ্নিক— পূজা।
তদারক— দেখাশোনা।
শঙ্কা— ভয়।
সংশয়— সন্দেহ।
কটাক্ষ— বাঁকা চাহনি বা দৃষ্টি।
বাগ্‌দি— নিম্ন শ্রেণির বাঙালি হিন্দু উপাধি।
তক্তপোশ— কাঠের খাট।

প্রশ্নাবলি

১। **সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।**

(ক) **রামের বৈমাত্র বড় ভাইয়ের নাম কী?**

(১) রামলাল (২) শ্যামলাল (৩) যদুলাল (৪) মাধবলাল।

(খ) **রাম কত বছর বয়সে মাতৃহারা হয়?**

(১) এক বছর (২) দুই বছর (৩) আড়াই বছর (৪) তিন বছর।

(গ) **নৃত্যকালী কে?**

(১) বাড়ির দাসী (২) রামের বোন (৩) নারায়ণীর বোন (৪) দিগম্বরীর দাসী।

(ঘ) **সুরধুনীর বয়স কত?**

(১) আট বছর (২) নয় বছর (৩) দশ বছর (৪) এগারো বছর।

(ঙ) **উঠোনের মাঝখানে কীসের চারা লাগিয়েছিল।**

(১) নিম (২) বেল (৩) অশ্বত্থ (৪) আম।

২। **শূন্য স্থান পূর্ণ করো।**

(ক) রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু ———— কম ছিল না।

(খ) রাম ——— ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(গ) রাম তার পোষা মাছ দুটোর নাম দিয়েছিল ——— এবং গণেশ।

(ঘ) শ্মশানকালীর ——— বড়।

(ঙ) আমার এত বড় দিব্যি যদি না মানো, সেইদিনে যেন তোমাকে আমার —— —— দেখতে হয়।

৩। **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।**

(ক) নারায়ণী কে?

(খ) 'টাকা দুদ্দিনের, কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের'। — কথাটি কে বলেছিল?

(গ) 'রামেব সুমতি' পাঠে ডাক্তারবাবুর ভিজিট কত ছিল?

(ঘ) নারায়ণীর মায়ের নাম কী?

(ঙ) কার্তিক-গণেশ কাদের নাম?

(চ) 'বাবু শিবতুল্য লোক, তাই মাপ করেছেন।' — বাবুটি কে?

(ছ) রামের ছোঁড়া পিয়ারায় কে আঘাত পেয়েছিল?

(জ) "আমাকে বিরক্ত করো না, তোমরা খাও গে।' কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয়েছে?

(ঝ) "আমি ভাল হয়েছি, আমার সুমতি হয়েছে।" — আমি কে?

৪। **৩/৪টি বাক্যে উত্তর দাও।**

(ক) সাতদিনেও নারায়ণীর জ্বর না-ছাড়ায় রাম ডাক্তারকে কীভাবে শাসিয়েছিল?

(খ) নারায়ণী রামকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি দিয়েছিলেন কেন?

(গ) অশ্বত্থ চারা উপড়ে ফেলায় ক্রুদ্ধ রামকে শান্ত করার জন্য নারায়ণী কী কৌশল অবলম্বন করেছিলেন?

(ঘ) "এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে।' —কে, কোন্ প্রসঙ্গে কথাটি বলেছেন?

(ঙ) কার্তিক-গণেশের পরিচয় দাও।

(চ) "এই ক্ষুদ্র স্কুলের জীবনে এত বড় কাণ্ড ইতিপূর্বে ঘটে নাই।' — কাণ্ডটি কী?

(ছ) "সারা রাত ঠেঙাবে নাকি?' — কে, কাকে উদ্দেশ্য করে কেন এ কথা বলেছেন?

(জ) রাম দিগম্বরীকে লক্ষ্য করে পিয়ারা ছুঁড়েছিল কেন?

(ঝ) "যা ভোলা, শিগগির ডেকে আন।" কে, কাকে ডেকে আনার কথা বলেছেন? সে কোথায় ছিল?

৫। **রচনাধর্মী উত্তরের জন্য প্রশ্ন।**

(ক) 'রামের সুমতি' পাঠটির নামকরণের যথার্থতা আলোচনা করো।

(খ) রামলালের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

(গ) রামলালের সঙ্গে দিগম্বরীর সদ্ভাব ছিল না কেন, তার যথার্থ কারণগুলো উল্লেখ করো।

(ঘ) রামলালের প্রিয় মাছ ধরা নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৬। **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।**

(ক) টাকা দুদিনের কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের।

(খ) দিন দিন একটা নতুন ফ্যাসাদ তৈরি হলে কী-করে গ্রামে বাস করি?

(গ) রামের বুকের ভিতর চাপা কান্না মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

(ঘ) আমার হুকুম নেওয়া হয়েছে।

৭। **টীকা লেখো—** শ্যামলাল; দিগম্বরী; রামলাল; নারায়ণী।

বাক্য সংকোচন

এক বা একাধিক শব্দে গঠিত বক্তব্যকে বাক্যাংশ বলে। যেমন : 'যা উড়ছে', 'বরণের যোগ্য', 'যা উদিত হচ্ছে' ইত্যাদি শব্দসমষ্টি হল বাক্যাংশ। এগুলি সংকুচিত করে লেখা যায়— 'উড়ন্ত বা উড্ডীয়মান', 'বরেণ্য', 'উদীয়মান' ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় বাক্য সংকোচনের নিপুণ প্রয়োগ ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। বাক্য সংকোচন নানাভাবে হয়। যেমন—

ক। কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা

যা বাড়ছে— বাড়ন্ত। যা চলছে— চলন্ত। যা দর্শন করা উচিত— দ্রষ্টব্য। যা বয়ে চলেছে— বহমান, বহতা। জানবার ইচ্ছা— জিজ্ঞাসা। পানের ইচ্ছা— পিপাসা। যা ডুবছে— ডুবন্ত। যে বা যারা যুদ্ধ করছে— যুধ্যমান। যা পুনঃ পুনঃ জ্বলছে— জাজ্বল্যমান। যা নিবারণ করা যায় না— অনিবার্য।

খ। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা

কাঁদা যার স্বভাব— কাঁদুনে। যে বিমান চালায়— বৈমানিক। যা মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি— মৃন্ময়। বালির সঙ্গে মিশ্রিত— বেলে। ভৃগুর অপত্য— ভার্গব। গঙ্গার সন্তান— গাঙ্গেয়। পেশা যার সাপ খেলানো— সাপুড়ে।

গ। সমাস দ্বারা

যে জামাই ঘরে থাকে— ঘর-জামাই। কপাল পোড়া যার— পোড়াকপাল। যার পত্নী গত হয়েছে— বিপত্নীক। যার নাম জানা নেই— অজ্ঞাতনামা। যার কুলশীল জানা যায় না— অজ্ঞাতকুলশীল।

ময়ূরের ডাক— কেকা। ঘোড়ার ডাক— হ্রেষা। যে নারীর পতি পুত্র কেউ নেই— অবীরা। যে হাজির নয়— গরহাজির। যেখানে যাওয়া কঠিন— দুর্গম। যে নারীর স্বামী আছে— সধবা। যাতে নুন নেই— আলুনি।

ঘ। স্বতন্ত্র পদের ব্যবহার ও উপসর্গ যোগ করে

যাতে সার পদার্থ নেই— অসার। যা আগে দেখা যায়নি— অদৃষ্টপূর্ব।

অনুকরণ করবার ইচ্ছা— অনুচিকীর্ষা। উপকার করবার ইচ্ছা— উপচিকীর্ষা।

জলে-ডাঙায়

সৈয়দ মুজতবা আলী
১৯০৩ — ১৯৮৭

বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি সব সময়ই এক হুলস্থুল ব্যাপার, তুমুল কাণ্ড! তাতে দুটো জিনিস সক্কলেরই চোখে পড়ে; সে দুটো— ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি।

তোমাদের কারো কারো হয়তো ধারণা যে সায়েব-সুবোরা যাবতীয় কাজকর্ম সারা করে যতদূর সম্ভব চুপিসারে আর আমরা চিৎকারে চিৎকারে পাড়ার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ না-করে কিছুই করে উঠতে পারিনে। ধারণাটা যে খুব ভুল সে কথা আমি বলব না। সিনেমায় নিশ্চয়ই দেখেছ, ইংরেজরা ব্যানকুয়েট (ভোজ) খায় কী রকম কোনো প্রকারের শব্দ না করে। বাটলাররা নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে, ছুরিকাঁটার সামান্য একটু ঠুং-ঠাং, কথাবার্তা হচ্ছে মৃদু গুঞ্জরনে, সব কিছু অতিশয় পরিপাটি, ছিমছাম।

আর আমাদের দাওয়াতে, পাল-পরবের ভোজে, যজ্ঞির নেমন্তন্নে?

তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে? বিশেষ, করে এ-সব বিষয়ে আমার গুরু সুকুমার রায় যখন তাঁর অজর অমর বর্ণনা প্লাটিনামাক্ষরে রেখে দিয়ে গিয়েছেন। শোনো :

'এই দিকে এসে তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড!
কেহ কহে 'দৈ আন' কেহ হাঁকে 'লুচি'
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা
অনাহারে কত ধারে হল প্রাণহত্যা।'

বলে কি। ভোজের নেমন্তন্নে প্রাণহত্যা। আলবাৎ! না হলে বাঙালির নেমন্তন্ন হতে যাবে কেন? পছন্দ না হলে যাও না ফাপ্পোতে। খাও না আলোনা, আধাসেদ্ধ শূয়ারের মুণ্ডু কিংবা কীসের যেন ন্যাজ।

কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সময় সব শেয়ালের এক রা।

আমি ভেনিসে দাঁড়িয়ে ইটালির জাহাজ ছাড়তে দেখেছি— জাহাজে বন্দরে, ডাঙায় জলে উভয় পক্ষের খালাসিরা মাক্কারনি খেকো খাঁটি ইটালিয়ান; আমি মার্সেলেসের বন্দরেও ঐ কর্ম দেখেছি— উভয় পক্ষের খালাসিরাই ব্যাঙ-খেকো সরেস ফরাসিস; আমি ডোভারে দাঁড়িয়ে ঐ প্রক্রিয়াই সাতিশয় মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি— দু পক্ষের বাঁদরগুলোই বীফস্টিক-খেকো খাটাশ-মুখো ইংরেজ। আর গঙ্গায়, গোয়ালন্দে চাঁদপুরে, নারায়ণগঞ্জে যে কত শত বার এই লড়াই

দেখেছি তার তো লেখাজোখা নেই। উভয় পক্ষে আমারই দেশভাই জাতভাই দাড়ি-দোলানো, লুঙ্গি-ঝোলানো সিলট্যা, নোয়াখাল্যা।

বন্দের বন্দরে তখন যে চিৎকার অট্টরব ও হুঙ্কারধ্বনি ওঠে সে সর্বত্রই একই প্রকারের। একই গন্ধ, একই স্বাদ। চোখ বন্ধ করে বলতে পারবে না, নারায়ণগঞ্জে দাঁড়িয়ে চাঁটগাঁইয়া শুনছো, না হামবুর্গে জর্মন শুনছো।

একটুখানি কল্পনার সাবান হাতে থাকলে ঐ অবস্থায় বিস্তর বাস্তবের বুদ্বুদ ওড়াতে পারবে।

ওদিকে এসব কলরব— মাইকেলের ভাষায় 'রথচক্র-ঘর্ঘর-কোদণ্ড টঙ্কার' ছাপিয়ে উঠছে ঘন ঘন জাহাজের ভেঁপুর শব্দ— ভোঁ, ভোঁ,— ভোঁ ভোঁ—

তার অর্থ, যদি সে ছোট জাহাজের প্রতি হয়, 'ওরে ও ছোকরা, সর না। আমি যে এক্ষুনি ওদিকে আসছি দেখতে পাচ্ছিসনে? ধাক্কা লাগলে যে সাড়ে বত্রিশভাজা হয়ে যাবি তখন কি টুকরোগুলো জোড়া লাগাবি গাঁদাপাতার রস দিয়ে?' আর যদি তোমার জাহাজের চেয়ে বড় জাহাজ হয়, তবে তার অর্থ 'এই যে, দাদা, নমস্কারম্। একটু বাঁ দিকে সরতে আজ্ঞে হয়, আমি তা হলে ডান দিকে সুড়ুৎ করে কেটে পড়তে পারি।' এবং এই ভেঁপু বাজানোর একটা তৃতীয় অর্থও আছে। প্রত্যেক জাহাজের মাঝিমাল্লারা আপন ভেঁপুর শব্দ চেনে। কেউ যদি তখনো বন্দরের কোনো কোণে আনন্দরসে মত্ত হয়ে থাকে, তবে ভেঁপুর শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ তার চৈতন্যোদয় হয় এবং জাহাজ ধরার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায়।

আমি একবার একজন খালাসিকে সাঁতরে এসে জাহাজে উঠতে দেখেছি। তখন তার আর সব খালাসি ভাইয়ারা যা গালিগালাজ দিয়েছিল তা শুনে আমি কানে আঙুল দিয়ে বাপ বাপ করে সরে পড়েছিলুম। ইংরাজিতে বলে, 'হি ক্যান সুয়ার লাইক এ সেলার' অর্থাৎ খালাসিরা কটূ বাক্য বলাতে এ দুনিয়ার সব চাইতে ওস্তাদ। ওরা যে ভাষা ব্যবহার করে সেটা বর্জন করতে পারলে দেশ-বিদেশে তুমি মিষ্টভাষীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে পারবে।

তোমার যদি ফার্সি-পড়নে-ওলা ক্লাস-ফ্রেন্ড থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করো, 'ইসকন্দর-ই-রূমীরা পুরসীদ'— অর্থাৎ 'আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল'— দিয়ে যে গল্প আরম্ভ, তার গোটাটা কী? গল্পটা হচ্ছে, সিকন্দরশাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'ভদ্রতা আপনি কার কাছে থেকে শিখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বে-আদবদের কাছ থেকে?' 'সে কী প্রকারে সম্ভব?' 'তারা যা করে আমি তাই বর্জন করেছি।'

'বদর বদর' বলে জাহাজ বন্দরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। অজানা সমুদ্রের বুকে ভেসে যাওয়ার ঔৎসুক্য এক দিকে আছে আবার ডাঙা থেকে ছুটি নেবার সময় মানুষের মন সব সময়ই একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে। অপার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সীমার শেষের দিগ্বলয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুক্ত মনের যত অগাধ আনন্দই পাও না কেন, ঝঞ্ঝাবাত্যার সঙ্গে দুর্বার সংগ্রাম করে করে ক্ষণে-বাঁচা ক্ষণে-মরার অতুলনীয় যত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করো না কেন, মাটির কোলে ফিরে আসার মতো মধুময় অভিজ্ঞতা অন্য কিছুতেই পাবে না। তাই ভ্রমণকারীদের গুরু, গুরুদেব বহু নদ-নদী সাগর-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পর বলেছেন—

'ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমি জাহাজের পিছন দিকে রেলিঙের উপর ভর করে তাকিয়ে রইলুম আলোকমালায় সুসজ্জিত মহানগরীর— পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দরের দিকে। সেখানে রাস্তায় রাস্তায়, সমুদ্রের জাহাজে জাহাজে আর জেলেদের ডিঙিতে ডিঙিতে কোথাও বা সারে সারে প্রদীপ শ্রেণি আর কোথাও-বা এখানে একটা, ওখানে দুটো, সেখানে একঝাঁক— যেন মাটির সাত-ভাই-চম্পা।

আমরা দেয়ালি জ্বালি বছরের মাত্র এ[illegible]দিনে। এখানে সম্বৎসর দেয়ালির উৎসব। এদের প্রতিদিনের প্রতি গোধূলিতে শুভ লগ্ন। আর এদের এ উৎসব আমাদের চেয়ে কত সর্বজনীন। এতে সাড়া দেয় সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের নরনারী— হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন পারসিক-মুসলমান-খ্রিস্টানি।

আমি জানি, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কোনো কোনো ছোট্ট পাখির রং যে সবুজ তার কারণ সে যেন গাছের পাতার সঙ্গে নিজের রং মিলিয়ে দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, যাতে করে শিকরে পাখি তাকে দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে না নিয়ে যেতে পারে। তাই নাকি আমের রঙও কাঁচা বয়সে থাকে সবুজ— যাতে পাখি না দেখতে পায়, এবং পেকে গেলে হয়ে যায় লাল, যাতে করে পাখির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে— যাতে সে যেন ঠুকরে ঠুকরে তাকে গাছ থেকে আলাদা করে দেয়, নিচে পড়ে তার আঁটি যেন নতুন গাছ গজাতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা ভুল, আমি বলি কী করে, বিজ্ঞানের আমি জানি কতটুকু, বুঝি কতখানি? কিন্তু আমার সরল সৌন্দর্য-তিয়াসি মন এসব জেনে-শুনেও বলে, 'না; পাখি যে সবুজ, সে শুধু তার নিজের সৌন্দর্য আর আমার চোখের আনন্দ বাড়াবার জন্যে। এর ভিতর ছোট হোক, বড় হোক কোনো স্বার্থ লুকনো নেই। সৌন্দর্য শুধু সুন্দর হওয়ার জন্যই।'

ঠিক তেমনি আমি জানি, পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে প্রতি গোধূলিতে যে আলোর বান জেগে ওঠে, তার মধ্যে স্বার্থ লুকনো আছে। ঐ আলোতে ব্যড়ি ফেরে, মা তার শিশুকে খুঁজে পায়, সবাই আপন আপন গৃহস্থালির কাজ করে; কিন্তু তবু, যখনই আমি দূরের থেকে এই আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনই মনে হয় এগুলো জ্বালানো হয়েছে শুদ্ধমাত্র দেয়ালির উৎসবকে সফল করার জন্য। তার ভিতর যেন আর কোনো স্বার্থ নেই।

অকূল সমুদ্রে পথহারা নাবিক তারার আলোয় ফের পথ খুঁজে পায়। সেই স্বার্থের সত্য উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন,

'তুমি কত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।'

বন্দরের আলোর দিকে তাকিয়ে যদি আমিও ভগবানের উদ্দেশে বলি—

'মোরা কত আলো জ্বালিয়েছি ঐ চরণে
কি আরতির লগনে।'

তবে কি বড্ড বেশি ভুল বলা হবে?

অনেক দূরে চলে এসেছি। পাড়ের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে এসেছে। তবু এখনো দেখতে পাই হুশ করে একখানা জেলে-ডিঙি আমাদের পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। আসলে কিন্তু সে হুশ করে চলে যায়নি। সে ছিল দাঁড়িয়েই, কারণ তার গলুই সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে, আমরা তাকে পেরিয়ে গেলুম মাত্র।

আশ্চর্য, এত রাত অবধি পাড় থেকে এত দূরে তারা মাছ ধরছে।

এখন যদি ঝড় ওঠে তবে তারা করবে কী? নৌকো যদি ডুবে যায় তবে তারা তো এতখানি জল পাড়ি দিয়ে ডাঙায় পৌঁছতে পারবে না। তবে তারা এ রকম বিপজ্জনক পেশা নিয়ে পড়ে থাকে কেন? লাভের আশায়? নিশ্চয় নয়। সে তত্ত্ব আমি বিলক্ষণ জানি। আমি একবার কয়েক মাসের জন্য মাদ্রাজের সমুদ্রপাড়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলুম। তারই পাশে ছিল, একেবারে সমুদ্রের গা-ঘেঁষে এক জেলেপাড়া। আমি পাকা ছটি মাস ওদের জীবন যাত্রা প্রণালী দেখেছি। ওদের দৈন্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমাদের গরিব চাষিরাও এদের তুলনায় বড়-লোক, এমনকী, আমাদের আদিবাসীরা, সাঁওতাল ভীলেরাও এদের চেয়ে এনক বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে। তোমাদের ভিতর যারা পুরীর জেলেদের দেখেছ তারাই আমার কথায় সায় দেবে।

তবে কি এরা অন্য কোনো সুযোগ পায় না বলে এই বিপদসংকুল, কঠিন অথচ দুঃখের জীবন নিয়ে পড়ে থাকে? আমার সেই মাদ্রাজি বন্ধু বললে, তা নয়, এরা নাকি খোলা সমুদ্র এত ভালোবাসে যে তাকে ছেড়ে মাঠের কাজে যেতে কিছুতেই রাজি হয় না। ঝড়ের সময় মাছ ধরা প্রায় অসম্ভব বলে তখন উপোস করে দিন কাটাবে, ক্ষুধায় প্রাণ অতিষ্ঠ হলে, ভুখা কাচ্চাবাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না-পারলে সেই ঝড়েই বেরয় মাছ ধরতে আর ডুবে মরে সমুদ্রের অথৈ জলে। তবু জল ছেড়ে ডাঙার ধান্দায় যেতে রাজি হয় না।

এবং নৌকোর মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসিদের বেলাও তাই। এদের জীবন এতখানি অভিশপ্ত নয়, জানি, কিন্তু এরাও ডাঙায় ফিরে যেতে রাজি হয় না। এমন কি, যে চাষা সাত শ পুরুষ ধরে খেতের কাজ করেছে, সেও যদি দুর্ভিক্ষের সময় দুপয়সা কামাবার জন্য সমুদ্রে যায় তবে কিছুদিন পরই তাকে আর ডাঙার কাজে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর পুরনো খালাসিদের তো কথাই নেই। গোঁফদাড়ি পেকে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল আর নোনা হাওয়ায় চামড়ার রঙটি ব্রোন্‌জের মতো হয়ে গিয়েছে, আর কদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই, জাহাজে কেউ চাকরি দিতে চায় না, তবু পড়ে থাকবে খিদিরপুরের এক ঘিঞ্জি আড্ডায় উদয়াস্ত এ-জাহাজ ও-জাহাজ করে করে বেড়াবে চাকরির সন্ধানে।

সমুদ্রের প্রতি কোনো কোনো জাহাজ-কাপ্তেনের এত মায়া যে বুড়ো বয়সে তারা বাড়ি বানায় ঠিক সমুদ্রের পাড়ে, এবং বাড়িটার ঢপ্‌ও কিম্ভুতকিমাকার। দেখতে আদপেই বাড়ির মতো নয়, একদম হুবহু জাহাজের মতো— অবশ্য মাটির সঙ্গে যোগ রেখে যতখানি সম্ভব। আর তারই চিলকোঠায় সাজিয়ে রাখে, কম্পাস, দূরবীন, ম্যাপ, জাহাজের স্টিয়ারিং হুইল এবং জাহাজ চালাবার অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম। বাড়ির আর কাউকে বুড়ো সেখানে ঢুকতে দেয় না— য়ুনিফর্মপরা না-থাকলে জাহাজের ও-জায়গায় তো কাউকে যেতে দেওয়া হয় না— এবং সে সেখানে পাইপটা কামড়ে ধরে সমস্ত দিন বিড়বিড় করে 'খালাসিদের' বকাঝকা করে। ঝড়বৃষ্টি হলে তো কথা নেই। তখন সে একাই একশ'। 'জাহাজ' বাঁচাবার জন্য সে তখন ক্ষেপে গিয়ে 'ব্রিজ'ময় দাবড়ে বেড়ায়, 'টেলিফোনে' চিৎকার করে 'এঞ্জিন-ঘর'কে হুকুম হাঁকে, 'আরো জলদি; পুরো স্পিডে', কখনো বা বরষাতিটা গায়ে চাপিয়ে 'ব্রিজ' খুলে 'ডেকের' তদারকি করে ভিজে কাঁই হয়ে ফের 'ব্রিজে' ঢুকবে। ঝড় না থামা পর্যন্ত তার দম ফেলার ফুরসত নেই, ঘুমুতে যাবার তো কথাই ওঠে না। ঝড় থামলে হাঁফ ছেড়ে বলবে, 'ওঃ, কি বাঁচনটাই না বেঁচে গিয়েছি। আমি না-থাকলে সব ব্যাটা আজ ডুবে মরতো। আজকালকার ছোঁড়ারা জাহাজ চালাবার কিস-সু-টি জানে না।'

তিন দিন পরে গুমগুম করে 'জাহাজ' থেকে নেমে সে পাড়ার আড্ডায় যাবে গল্প করতে— 'জাহাজ' বন্দরে এসে ভিড়েছে কি না। সেখানে সেই মারাত্মক ঝড়ের একটা ভয়ংকর বর্ণনা দিয়ে শেষটায় পাইপ কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'আর না, এই আমার শেষ সফর। বুড়ো হাড়ে আর জলঝড় সয় না।' সবাই হা হা করে বলবে, 'সে কি, কাপ্তেন, আপনার আর তেমন কি বয়স হল?' কাপ্তেনও 'হেঁ-হেঁ করে মহাখুশি হয়ে 'জাহাজে' ফিরবে।

আমি আরো দুই শ্রেণির লোককে চিনি যারা কিছুতেই বাসা বাঁধতে চায় না।

দেশ-বিদেশে আমি বিস্তর বেদে দেখেছি। এরা আজ এখানে কাল ওখানে, পরশু আরো দূরে, অন্য কোথাও। কখন কোন জায়গায় কোন মেলা শুরু হবে, কখন শেষ হবে, সব তাদের জানা। মেলায় মেলায় গিয়ে কেনা-কাটা করবে, নাচ দেখাবে, গান শোনাবে, হাত গুনবে, কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বেশি দিন থাকবে না। গ্রীষ্মের খরদাহ, বর্ষার অবিরল বৃষ্টি সব মাথায় করে চলেছে তো চলেছে, কীসের নেশায় কেউ বলতে পারে না। বাচ্চাদের লেখা-পড়া শেখাবার চাড় নেই, তাদের অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যিরও তোয়াক্কা করে না। যা হবার হোক, বাসা তারা কিছুতেই বাঁধবে না। বাড়ির মায়া কি তারা কখনো জানেনি, কোনো দিন জানবেও না।

ইংলন্ড দুশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে এদের কোনো জায়গায় পাকাপাকিভাবে বসিয়ে দিতে। টাকা-পয়সা দিয়েছে, কিন্তু না, না, না, এরা কিছুতেই কোনো জায়গায় কেনা-গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। ইংলন্ড যে তার দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা পুরো একশ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ এই বেদেরা। এরা তো আর কোনো জায়গায় বেশি দিন টিকে থাকে না যে এদের বাচ্চারা ইস্কুল যাবে? শেষটায় ইংরেজ এদের জন্য ভ্রাম্যমাণ পাঠশালা খুলেছে, অর্থাৎ পাঠশালার মাস্টার শেলেট পেনসিল নিয়ে ভবঘুরে হয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া লাগাচ্ছে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, তারা যেমন ছিল তেমনি আছে।

খোলা-মেলার সন্তান এরা, গণ্ডির ভিতর বন্ধ হতে চায় না। কিন্তু এদের সবাইকে হার মানায় কারা জানো?

রবীন্দ্রনাথ যাদের সম্বন্ধে বলেছেন,—

'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।'

এই যে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে আদন বন্দেরর দিকে যাচ্ছি এরা সেই দেশের লোক। সৃষ্টির আদিম প্রভাত থেকে এরা আরবের এই মরুভূমিতে ঘোরঘুরি করছে। এরা এদিক-ওদিক যেতে যেতে কখনো ইরানের সজল উপত্যকার কাছে এসে পৌঁছেছে, কখনো লেবাননরে ঘন বনমর্মরধ্বনিও শুনতে পেয়েছে কিন্তু এসব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করার কণামাত্র লোভ এদের কখনো হয়নি। বরঞ্চ মরুভূমির এক মরূদ্যান থেকে আরেক মরূদ্যান যাবার পথে সমস্ত ক্যারাভান (দল) জলের অভাবে মারা গেল— এ বীভৎস সত্য তাদের কাছে অজানা নয়, তবু তারা ঐ পথ ধরেই চলবে, কোনো জায়গায় স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাব তাদের মাথায় বজ্রাঘাতের ন্যায়।

(সংক্ষেপিত)

লেখক পরিচিতি : সৈয়দ মুজতবা আলী



সৈয়দ মুজতবা আলী শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ সিকন্দর আলী ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। ১৯২৬ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিকেতন থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্বভারতীতে (শান্তিনিকেতন) তিনি বহু ভাষা শেখার সুযোগ পান। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে তিনি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি উর্দু, ফরাসি, জর্মান, হিন্দি, গুজরাটি, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে জর্মানের বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক দর্শন শাস্ত্রে গবেষণা করে ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে তাঁর চাকুরি জীবন শুরু। ১৯৬১ সালে তিনি বিশ্বভারতীর ইতিহাস বিভাগে রীডার হিসেবে যোগদান করেন।

সাহিত্য রচনায় মুজতবা আলী ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের লেখক। তাঁর গদ্য বাংলাসাহিত্যে চিরকালের আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি 'দেশে-বিদেশে'(১৯৪৯), 'চাচাকাহিনি'(১৯৫২), 'জলে-ডাঙায়'(১৯৬০), প্রভৃতি। ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এই কুশলী সাহিত্যিকের দেহাবসান ঘটে।

পাঠ-প্রসঙ্গ

'জলে-ডাঙায়' সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত ভ্রমণ সাহিত্য। আলী সাহেব আজীবন নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা। এই পাঠে তাঁর জাহাজ-চড়ে ভ্রমণের কথা আছে। সঙ্গে আছে তাঁর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার সরস বর্ণনা। সবই 'মজলিসী' ঢঙে পরিবেশিত।

আলী সাহেবের চোখ দিয়ে শিক্ষার্থীরা জেনে নিতে পারবে নানা দেশ ও জনজীবনের টুকরো-টাকরা কথা। এবং অন্তরে অনুভব করবে ভ্রমণ-পিপাসা। সংস্কৃতি-শিক্ষার পাঠও তারা গ্রহণ করতে পারবে।

টীকা

আলেকজান্ডার

আলেকজান্ডার গ্রিসের ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ও পরাক্রমী, দূরদর্শী ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে। তিনি দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (৩৮৪—৩২২ খ্রি.পূ.) নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। ৩৩৬ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে তিনি ম্যাসিডনের রাজা হন। তাঁর রাজ্যাভিযান ছিল পরাক্রমী, বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি পারসিক দরিয়াসকে পরাস্ত করে ইজিপ্ত দখল করেন। এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরী নির্মাণ করেন। ৩৩১ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে তিনি সমগ্র পারস্য জয় করেন। এবং ভারতবর্ষে এসে উপনীত হন। ভারতের রাজা পুরু তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। এরপর আলেকজান্ডার স্বদেশ ফিরে যাবার পথে ৩২৩ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে ব্যাবিলনে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।



আলেকজান্ডার

বেদে

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে বীরভূম মেদিনীপুর, অঞ্চলে যাযাবর এক মানবগোষ্ঠীকে বেদিয়া, সংক্ষেপে বেদে বলা হয়। তারা সাপের খেলা, দড়ির খেলা ইত্যাদিতে পারদর্শী এবং তা দেখিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। নানা ধরনের ঝাড়ফুঁক, টোটকা ও ওষুধও তাদের জানা আছে। এরা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে।

শব্দার্থ

বন্দর—জাহাজ ঘাট।
অতিষ্ঠ— আনচান, ন তিষ্ঠ, টেকা দায়।
গুঞ্জরন— গুনগুন শব্দ।
দ্বন্দ্বরণে— দ্বন্দ্ব মানে বিবাদ। রণে মানে যুদ্ধ,
বাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধবিবাদ
আলোনা— নুনহীন, পানসে।
খাটাশ— জন্তু বিশেষ।
সিলট্যা— শ্রীহট্টের অধিবাসী, এটি প্রাদেশিক/গ্রাম্য শব্দ।
অট্টরব— গণ্ডগোল, কলরব।
নিষ্কৃতি— রেহাই।
রপ্ত— অভ্যাস।
কটু-বাক্য—গালমন্দ, মন্দ-কথা।
ওস্তাদ— দক্ষ, নিপুণ।
মিষ্টভাষী— মধুর কথা বলে যে।

চুপিসারে—নীরবে, চুপে চুপে
মৃদু—কোমল।
দাওয়াত—মহাভোজ
রণ— যুদ্ধ।
সাতিশয়— অতিশয়।
দেশভাই—দেশের সূত্রে ভাই, দেশভ্রাতৃ
চাঁটগাঁইয়া— চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী।
মতলব— উদ্দেশ্য।
মত্ত— উন্মাদ, আসক্ত।
বর্জন— ত্যাগ।
খ্যাতি—সুনাম।

অর্জন—লাভ করা, আয়ত্ত।
মাশুল— প্রদেয় কর।
অব্যক্ত— যা বলা যায় না, বলা হয়নি।
দিগ্বলয়— দিগন্তরেখা, আকাশ ও পৃথিবী যেখানে এসে মিশেছে।
দুর্বার— যা বারণ বা রোধ করা যায় না, প্রবল।
মধুময়— মধুর, মধুমাখা, মধুসিক্ত।
সম্বৎসর— সারা বছর জুড়ে।
গৃহস্থালি— ঘরকন্না।
বিপদসঙ্কুল— বিপজ্জনক, বিপদ আছে যেখানে।
অতিষ্ঠ— টেকা দায়, কাতর।
অভিশপ্ত— শাপগ্রস্ত।
আদতেই— মোটেই, একেবারেই
ফুরসত— অবকাশ।
অবিরল— বিরামহীন, প্রচুর, প্রাচুর্য।
ভবঘুরে— বিবাগী।
বীভৎস— সংঘাতিক, দৃষ্টিকটু।
দারুণ— অসাধারণ, চমৎকার
ঔৎসুক্য— কৌতূহল।
ঝঞ্ঝাবাত্যা— ঝড়বাতাস, ঝড়তুফান, প্রবল বায়ুপ্রবাহ।
অগাধ— অনেক, অঢেল, সুগভীর।
অতুলনীয়— যার তুলনা নেই, তুলনাহীন।
তিয়াসী— পিয়াসি, পিপাসিত।
শিকরে পাখি— শিকারি পাখি।
গলুই— নৌকার সম্মুখ বা পেছনের সরু অংশ।
রাজি—সম্মত।
ভুখা— ক্ষুধার্ত।
কিম্ভুতকিমাকার— কী রকম অদ্ভুত আকৃতির।
দাবড়ে— শাসিয়ে।
খরদাহ— সূর্যের প্রখর তাপ।
তোয়াক্কা— সমীহ।
বনমর্মরধ্বনি— বনের জীর্ণ গাছ-পাতা-লতার শব্দ, সুর।

১. **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও—**

ক. বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি কেমন?
খ. 'ব্যানকুয়েট' কথার অর্থ কী?
গ. 'ফিরে চল ফিরে চল মাটির টানে'। কথাটি কার?
ঘ. 'এখানে সম্বৎসর দেয়ালির উৎসব'। কোথায়?
ঙ. আলেকজান্ডার কে ছিলেন?
চ. 'খোলা-মেলার সন্তান এরা'— কারা?
ছ. আদান বন্দর কোথায় অবস্থিত?
জ. 'এরা আরবের এই মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছে'— এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?
ঝ. ক্যারাভান' কথার অর্থ কী?
ঞ. 'বাড়ির মায়া কি তারা কখনো জানেনি'—কারা?
ট. মার্সেলেস বন্দর কোথায় অবস্থিত?

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও—**

ক. বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার সময় দুটো জিনিস সকলের চোখে পড়ে। তা কী?
খ. 'এই ভেঁপু বাজানোর একটা তৃতীয় অর্থও আছে।' —অর্থটি কী লেখো।
গ. 'তারা যা করে আমি তাই বর্জন করেছি।' —উক্তটি কার? তিনি কী বর্জন করেছিলেন এবং কেন?

ঘ. 'জলে-ডাঙায়' পাঠে উল্লেখিত দুটি বন্দরের নাম লেখো।

ঙ. ইংরেজদের ভোজ খাওয়ার পরিবেশ কেমন?

চ. সুকুমার রায় কে? তাঁর একখানি গ্রন্থের নাম বলো।

ছ তিনটি তদ্ভব শব্দ লিখ। যেমন— যজ্ঞি।

জ. 'দড়ির মনের কথা জানিসনে'— উক্তিটি কার? প্রসঙ্গ উল্লেখ করো।

ঝ. 'জলে-ডাঙায়' পাঠ অবলম্বনে আলেকজান্ডারের গল্পটি লেখো।

ঞ. কোনো ছোট্টপাখির রং যে সবুজ তার কারণ বর্ণনা করো।

৩. **চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও—**

ক. ইংরেজদের ভোজ-খাবার পরিবেশ কেমন?

খ. জাহাজ ছাড়ার সময় সব শেয়ালের এক রা। কথাটার মানে বুঝিয়ে বলো।

গ. 'ওরে ও ছোকরা, সর না'। —এখানে 'ছোকরা' কে? উক্তিটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করো।

ঘ. 'জল ছেড়ে ডাঙার ধান্দায় যেতে রাজি হয় না।' —উক্তিটি কার? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তা আলোচনা করো।

ঙ. নৌকোর মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসিদের সম্পর্কে লেখক যে মন্তব্য করেছেন তা আলোচনা করো।

চ. সমুদ্রের প্রতি কাপ্তেনদের মায়ার কারণ কী?

ছ 'বেদে'—জাতির জীবন প্রণালী লেখকের অনুসরণে বর্ণনা করো।

৪. **রচনাধর্মী উত্তর লেখো—**

ক. জাহাজ বন্দরের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল লেখকের, তা বর্ণনা করো।

খ. বেদে বেদুইনদের জীবনপ্রণালী ব্যাখ্যা করো।

গ. জাহাজের কাপ্তেনদের কথা যা জান লেখো।

ঘ. বন্দরে-বন্দরে গোধূলিতে যে-আলোর বান জেগে ওঠে লেখকের অনুসরণে তার বর্ণনা দাও।

৫. **পঠিত গদ্যরচনা থেকে তদ্ভব শব্দগুলো বাছাই করো।** যেমন—

তদ্ভব : কামে (< কর্মে), যজ্ঞি, নেমতন্নে,

৬. দেশী শব্দকে ক্রিয়াপদে ব্যবহার করা হয়েছে এই পাঠে, যেমন—

চড়াক্‌সে, ফ্যাঁচ করে, দাড়ি-দোলানো, সর, বাপ-বাপ করে, ডিঙোতে-ডিঙোতে, হুস করে, এমন আরও দশটি ক্রিয়াপদ লেখো।

৭. মুজতবা আলীর পাঠ অবলম্বনে দশটি বিদেশী শব্দ লেখো।

বিদেশী শব্দ : দাওয়াত, আলবৎ, খালাসি

৮. **বাক্য রচনা করো—**

সব শেয়ালের এক রা। ল্যাজে-গোবরে।

৯. **শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো মুখস্থ করো। এবং বাক্য রচনা করো।**

গালিগালাজ, খোলামেলা, ডাক্তার-বদ্যি, অসুখ-বিসুখ, জল-ঝড়, পাল-পরব, কাচু-মাচু, আল্লা-রসুল্লের, ছুটোছুটি, চেঁচামেচি, সায়ের-সুবো, ছুড়ি-কাঁটা, কথাবার্তা, ছিমছাম, ভোজভাত, হাতাহাতি, দ্বন্দ্বরণে, লেখাজোখা, দড়াদড়ি— ভোঁ-ভোঁ, ঠুংঠাং, গুঁতাগুঁতি।

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
১৮৮২—১৯২২

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে— বরদ বঙ্গে;
বাম হাতে যার কম্‌লার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণ পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে
আমরা বাঙালি বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লিনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান কপিল সাংখ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপংকর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালির ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম কম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম্'— মোদেরি প্রচীন কীর্তি
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান্— যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোনো সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশীষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি তাই কুঠিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালির ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালি সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালি দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালির কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালি জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
(সংক্ষেপিত)

কবি পরিচয়



'ছন্দের জাদুকর' নামে বাংলা কাব্য জগতে বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি ২৪ পরগণা জেলার নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রজনীনাথ দত্ত ও মাতা মহামায়া। সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বিখ্যাত লেখক ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৪৩ সালে প্রকাশিত) সম্পাদক। সাহিত্য রচনাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ

হল 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র আবীর', 'তীর্থ সলিল' ইত্যাদি। ছন্দ সম্পর্কিত তাঁহার সম্পাদিত রচনা 'ছন্দ সরস্বতী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন মধ্য বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কবিতাটির মূলভাব

'আমরা' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালির শৌর্য-বীর্য ও গৌরবগাথার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। বঙ্গকে কবি তীর্থ বলেছেন। এখানে কলুষ-নাশিনী গঙ্গার মুক্তি ধারায় জীবের মুক্তি ঘটে। বঙ্গের মুকুট স্বরূপ কাঞ্চন-শৃঙ্গে সূর্যের স্বর্ণোজ্জ্বল রশ্মিতে ভুবন আলোকিত। ধনধান্যে, পুষ্পে ভরা এ দেশের বুকে রয়েছে অপার স্নেহ-মমতা। এমন দেশের কোলে আমরা বাঙালি বাস করি। দুঃসাহসের পাখায় ভর করে বাঙালি অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বীর-বিক্রমে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে মুক্ত করেছে। এ দেশের ধুলিকণায় মিশে আছে সুপ্রাচীন কত কৃতবিদ্যের কাহিনি। জ্ঞানে-বিদ্যায় কপিল, অতীশ দীপঙ্কর, জয়দেব আপন কীর্তিতে আজও ভাস্বর। শিল্প-সংস্কৃতিতে বাঙালির অবদান অসামান্য। স্থাপত্য, ভাস্কর্যে বিটপাল, ধীমান অজেয়, অমর। শ্যাম কম্বোজের 'ওঙ্কার ধাম' বাঙালির কীর্তি বহন করছে। অজন্তা, ইলোরার শিল্পকলা আজও সবাইকে বিস্মিত করে। কীর্তন আর বাউলের গান সবার অন্তরের নিভৃত দরোজা খুলে দিয়েছে। এ ছাড়াও আধ্যাত্মিক শক্তির বলে বাঙালি মহামারী, মন্বন্তরেও বেঁচে আছে। মানুষের মধ্যে দেবতা বিরাজমান এই বিশ্বাসের ফলেই নিমাই, বিবেকানন্দের বাণীতে বিশ্ববাসী সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। বাঙালি সাধক সাধনার ফলে জড়ের মধ্যে প্রাণের সাড়া আবিষ্কার করে বিশ্বের দরবারে আপন স্থান করে নিয়েছে। মানবজাতির মহামিলনের গান কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কবি আশাবাদী, সত্যকে পাথেয় করে ভবিষ্যতে বিধাতার অসম্পূর্ণ কাজ বাঙালি সাধক করতে সক্ষম হবে। সমগ্র মানব জগতকে মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে দেবাতার ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

পাঠটির উদ্দেশ্য

'আমরা' কবিতায় বাঙালির গৌরব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অতীতকাল থেকেই বাঙালি শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। বাঙালি ভীরু, কাপুরুষ নয়। জ্ঞানে-বিদ্যায় আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালি সবাইকে এক সুতোয় বেঁধে রাখার প্রয়াস করে। বাঙালি গৌরব কাহিনি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হবে, এ উদ্দেশ্যে পাঠটি সংকলিত।

শব্দার্থ

মুক্তবেণী — বন্ধনহীন কেশপাশ, এখানে গঙ্গার তরঙ্গ। মারী— মড়ক। ভাল— কপাল। ভূষিত— অলংকৃত। বন্দনা— স্তব, স্তুতি। তরঙ্গ— লহর, ঢেউ। বাঞ্ছিত— ঈপ্সিত। প্রপিতামহ— পিতামহের পিতা অর্থাৎ ঠাকুরদাদার বাবা। পক্ষধর— চন্দ্র। তুষার— বরফ। পটুয়া— পট অঙ্কন করে যে, চিত্রশিল্পী। তপ— তপস্যা। জড়— অচেতন। সমন্বয়— মিলন। শৌর্য— বীরত্ব। স্পন্দন— কম্পন। যশ— খ্যাতি। হীরক— হীরা। নিধান— ভাণ্ডার। কীর্তি— যশ, খ্যাতি। কোকনদ— লাল পদ্ম। কায়া— দেহ। অমিয়— অমৃত। সুরভি— সৌরভ, পুরাণের দুগ্ধবতী গাভী। দ্বেষাদ্বেষি— শত্রুতা। কনক— সোনা। অবিনশ্বর— যার বিনাশ নেই।

টীকা

গঙ্গা

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (আন্তর্জাতিক) নদী। গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৫২৫ কিলোমিটার। এই নদী পতিতপাবনী। জনমানসে এই বিশ্বাস আছে যে গঙ্গায় স্নান করলে সব রকম পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী।

গঙ্গার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পাটলিপুত্র কনৌজ কাশী এলাহাবাদ মুঙ্গের প্রভৃতি প্রাচীন শহরগুলি এই নদীর তীরে অবস্থিত।

রামচন্দ্র

মহাকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের অন্যতম প্রধান চরিত্র রামচন্দ্র। তাঁর পিতার নাম দশরথ। মাতার নাম কৌশল্যা। তিনি পিতৃ-সত্য রক্ষার জন্য চৌদ্দ বছর বনবাস যাপন করে রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তিনি লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করেন। তাঁর রাজত্বে অপার সুখশান্তি বিরাজ করত। এই জন্য রাম রাজত্ব বলে একটা কথা প্রচলিত আছে।

মগ

বাংলাদেশের একটি উপজাতি। বার্মার আরাকান জাতির বংশধর, যারা ১৫০০—১৭০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জলদস্যু তথা আরাকান রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালায়; এবং স্থানীয় মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে বাটাভিয়াতে (বর্তমান জাকার্তা) ক্রীতদাস হিসেবে চালান করে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল।

মোগল

আদি 'মোঙ্গল' কথাটি থেকে বর্তমান মোগল বা মুঘল নামের উদ্ভব হয়েছে। একাধিক উপজাতিতে বিভক্ত এই মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত মোঙ্গলিয়া অঞ্চল। তে-মুচিন নামক এক শক্তিশালী মোঙ্গল-নায়ক প্রতিদ্বন্দ্বী তাতার জাতিকে পরাজিত করে মোঙ্গলদের একত্রিত করেন। অসাধারণ শক্তিমত্তার দরুন তাঁর নাম হয় চেঙ্গিজ খাঁ। 'চেঙ্গিজ' কথার অর্থ অসাধারণ শক্তিধর। চেঙ্গিজ খাঁর মৃত্যুর পর তৈমুরলঙের উত্থান ঘটে। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত আক্রমণ করেন ও দিল্লি লুণ্ঠন করেন। এরপর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

রাণা প্রতাপ



ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিধর প্রতিপক্ষ ছিলেন রাণাপ্রতাপ সিংহ। স্বাভিমানী এই রাজপুত সেনানী প্রায় একা মোগলের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। রাজপুত ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি কখনো মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেননি, যেমন করেছিলেন মানসিংহ। ফলে মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হল। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবরের বৃহত্তম সৈন্যদলের সঙ্গে সামান্য সৈন্য নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রাণাপ্রতাপ। যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হয়েছিল। তাঁর শৌর্যগাথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ, এবং তা আজও ভারতবাসীর প্রাণে উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

কপিল অথবা সাংখ্যকার

ভারতীয় ষড়দর্শনের অন্যতম সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যকে ভারতের প্রাচীনতম দর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। মহর্ষি কপিল এই দর্শনের সূত্রকার। তাই সাংখ্যকে কপিল মত বা কপিল দর্শন হিসেবেও জানা যায়। কপিলের শিষ্য ছিলেন আসুরি। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ। কথিত আছে যে দুঃখ জর্জরিত কপিল মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর শিষ্য আসুরিকে পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট সাংখ্যশাস্ত্র প্রদান করেছিলেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত 'সাংখ্যকারিকা' সাংখ্য সম্প্রদায়ের সর্ব প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ।

অতীশ দীপংকর



অতীশ দীপংকর সেই প্রাচীন কালে বাংলদেশকে বিশ্বের কাছে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কল্যাণ শ্রী। দীপংকর ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত, যিনি পাল সাম্রাটের আমলের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। রানি প্রভাবতী দেবীর গর্ভে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ছোটবেলায় তাঁর নাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। মাত্র তিন বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় পড়তে শিখেছিলেন তিনি, এবং বৌদ্ধধর্ম ও অন্য ধর্মের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১০৩৭ সালে তিনি বাংলা থেকে তিব্বত যাত্রা করেন। এবং ১০৫৪ সালে তিনি দেহরক্ষা করেন।

জয়দেব

দ্বাদশ শতকের (১১০১—১২০০ খ্রিস্টাব্দ) কবি জয়দেব। পশ্চিমবঙ্গের অজয়নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ তাঁকে মিথিলা বা উড়িষ্যার অধিবাসী বলেও মনে করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ভোজদেব এবং মাতা বামাদেবী। জয়দেব ছিলেন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের (আনুমানিক ১১১৯— ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ) রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম। জয়দেবের বিখ্যত রচনা সংস্কৃত গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দম্'।

কীর্তন

বাংলা সংগীতের অন্যতম আদি ধারা। সাধারণ লোকের পক্ষে অতি সহজে ঈশ্বর সাধনার উপায় হিসেবে এর উদ্ভব। গানের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের ধারা বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলার বৈষ্ণবধর্মজাত সংগীতধারার বিকশিত রূপ কীর্তন। এতে সাধারণ ঈশ্বরের গুণ ও লীলা বর্ণিত হয়। কীর্তন দুরকম নামসংকীর্তন বা নামকীর্তন এবং লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন।

বাউল



লোকসম্প্রদায়ের একটি সাধনভজন গোষ্ঠী। এরা গ্রামে গঞ্জে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের দেখা গেলেও মূলত কুষ্ঠিয়া মেহরপুর চুয়াডাঙা ঝিনাইদহ ফরিদপুর পাবনা অঞ্চলে এঁদের দেখা যায়। বাউলরা দেহভিক্তিক গুপ্ত সাধনার অনুসারী। এই সাধনায় সুফি ও সহজিয়া সাধনার মিলন ঘটেছে। কোনো ধর্মগ্রন্থে বাউলদের বিশ্বাস নেই। এঁরা জাতিভেদ মূর্তিপূজা বর্ণপ্রথা মানেন না। বাউলরা মানবতাবাদী। বাংলার বিখ্যাত বাউল হলেন লালন ফকির।

নিমাই

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্য নাম নিমাই। কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে বালক নিমাইয়ের নানা উপভোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন।

বিবেকানন্দ



উনবিংশ শতকের (১৮০১—১৯০০) কলকাতার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। তাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগরের মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন বিদ্যালাভের জন্য এবং ১৮৭৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিবেকানন্দ এক অনন্য প্রতিভা। দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পকলা, সংগীত প্রভৃতিতে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল। কণ্ঠসংগীতেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন।

১৮৮৪ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি বি.এ পাশ করেন।

বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বর উপলব্ধি, আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। বিবেকানন্দ আধুনিক কালে ধর্ম সংস্কৃতি এবং ভারতবাসীর জাতীয় আত্মচেতনার রূপ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন।

অনুশীলনা

১. (ক) **সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।**

(১) 'আমরা' কবিতার কবি কে?
(১) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (২) জীবনানন্দ দাশ (৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪) মধুসূদন দত্ত।

(২) কবির মতে বাঙালি কোথায় বাস করে?
(১) অসম (২) বঙ্গ (৩) বিহার (৪) উড়িষ্যা।

(৩) দশানন জয়ী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
(১) দশরথ (২) সুগ্রীব (৩) রাম (৪) লক্ষ্মণ।

(৪) বাংলার কবি কাকে বলা হয়েছে?
(১) বিদ্যাপতি (২) চণ্ডীদাস (৩) কৃত্তিবাস (৪) জয়দেব।

(৫) 'ছন্দের জাদুকর' আখ্যায় কোন কবি ভূষিত হয়েছেন?
(১) মধুসূদন দত্ত (২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (৩) রবীন্দ্রনাথ (৪) জসীমউদ্‌দীন।

(খ) ভুল শব্দ সরিয়ে শুদ্ধ করে বাক্যটি লেখো।

(১) মুক্তবেণীর নর্মদা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে।
(২) নদী যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে।
(৩) আমাদের ছেলে প্রতাপ সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়।
(৪) জ্বালিল জ্ঞানের দীপ চীনে বাঙালি দীপংকর।
(৫) বাঙালির ছেলে ফিরে এল দেশে জয়ের মুকুট পরি।

(গ) কবিতাটি অবলম্বনে শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

(১) আমরা বাঙালি বাস করি সেই —— বঙ্গে।
(২) ——সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।
(৩) এক হাতে মোরা —— রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে।
(৪) জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান কপিল ——।
(৫) শ্যাম কম্বোজে —— মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।
(৬) মনের গোপনে নিভৃত—— দ্বার ছিল যতগুলি।

২. **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।**

(ক) 'আমরা' কবিতার কবি কে?
(খ) বাংলা সাহিত্যে কে ছন্দের জাদুকর হিসেবে পরিচিত?
(গ) গঙ্গা কী বিতরণ করে?
(ঘ) রামচন্দ্রের পিতার নাম কী?

(ঙ) লঙ্কা কে জয় করেছিলেন?
(চ) 'বীর সন্ন্যাসী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
(ছ) কবি কার ঋণ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন?
(জ) 'আমরা' কবিতায় আমরা কারা?

৩. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও।**

(ক) "এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক হার।" —কে, কীভাবে হীরক হার গেঁথেছেন?
(খ) "আমরা বাঙালি বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।" — কবি বঙ্গকে বাঞ্ছিত ভূমি বলেছেন কেন?
(গ) কবি জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলির পরিচয় দাও।
(ঘ) "তপের প্রভাবে বাঙালি সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া।" — বাঙালি সাধক বলতে কার কথা বলা হয়েছে? তিনি কীভাবে জড়ের সারা পেয়েছেন?

৪. **রচনামূলক উত্তরের জন্য প্রশ্ন।**

(ক) 'আমরা' কবিতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করো।
(খ) 'আমরা' কবিতা অবলম্বনে বঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনা করো।
(গ) বাঙালির শৌর্য-বীর্যের কথা কবি কীভাবে বর্ণনা করেছেন?
(ঘ) বিদ্যা ও জ্ঞানে বাঙালির কৃতিত্বের আলোচনা করো।
(ঙ) ভাস্কর্য শিল্পে বাঙালির অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করো।
(চ) "বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালির গৌরবে" — উদ্ধৃতাংশের যথার্থতা আলোচনা করো।

৫. **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।**

(ক) আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে— বরদ বঙ্গে।
(খ) বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরি মাথায় নাচি।
(গ) বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপংকর।
(ঘ) বাঙালির ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।
(ঙ) স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি
শ্যাম কম্বোজে 'ওঙ্কারধাম' মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।
(চ) বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।

৬. **ভাষা-ব্যাকরণ ঃ**

(ক) **প্রত্যয় নির্ণয় করো**
মুক্তি; ভুবন; জ্ঞানী; ঠাকুরালি; নবীন; দেবতা; জয়।

(খ) **এক কথায় প্রকাশ করো।**
বর দান করেন যিনি। যে বস্তু চাওয়া হয়। দশটি আনন যার। অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিকের মিলিত বাহিনী। এক মনুর শাসন কাল থেকে অন্য মনুর শাসন কালের আরম্ভ। যার বিনাশ নেই। পুণ্য কামনায় যেখানে বহুজনের সমাবেশ ঘটে। ধাতু, পাথর ইত্যাদি দিয়ে মূর্তি বানায় যে।

বর্ণানুক্রমে বাক্য-সংকোচনের উদাহরণ দেওয়া হল।

অদিতির পুত্র— আদিত্য। আতপ চাল— আমান্ন।
আত্ম থেকে জন্মে যে— আত্মজ। যার প্রসব-কাল নিকটবর্তী হয়েছে— আসন্নপ্রসবা।
যা প্রথমে মধুর, কিন্তু পরিণামে নয়— আপাতমধুর। পরলোকে যার বিশ্বাস আছে--- আস্তিক।

ইন্দ্রকে জয় করেছেন যিনি— ইন্দ্রজিৎ। ইহার তুল্য— ঈদৃশ।
হস্তির নেত্র গোলক— ঈষিকা। অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি— ইষ্টাপত্তি।

যা মাটি ভেদ করে ওঠে— উদ্ভিদ। কূলের নিকটে— উপকূল
যা বুকে হেঁটে চলে— উরগ। উপদেশ ছাড়া জাত প্রথম জ্ঞান— উপজ্ঞা।
যা বেলা বা তীর অতিক্রম করে— উদ্বেল। নীল বর্ণের বানর— উল্লুক।

শ্বেত পদ বিশিষ্ট মৃগ— ঋষ্য। ঋতুতে ঋতুতে যিনি যজ্ঞ করেন— ঋত্বিক।
ঋষির মতো— ঋষিকল্প। গ্রহের কুদৃষ্টি— ঋষ্টি।

একবার আহার করেন যিনি— একাহারী। সধবার লক্ষণ— এয়োতি।
একমতের ভাব— ঐকমত্য। একাধিক জনের ভোগ্য— এজমালি।
পরস্পর একই কাজে লিপ্ত— একক্রিয়। হরিণের মতো চোখ যার— এণাক্ষী।

অন্য নামে— ওরফে। নির্ধারিত সময়ে— ওয়াদা
ওষুধ পাওয়া যায় যেখানে— ঔষধালয়। যে গাছ ফল পাকলে মরে যায়— ওষধি।
শুক্রাচার্য প্রণীত গ্রন্থ— ঔকনিস। উপন্যাস লেখেন যিনি— ঔপন্যাসিক।

বাঘের চামড়া— কৃত্তি। সন্ন্যাসীদের জলের পাত্র— কমণ্ডুল।
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না— কৃতঘ্ন। পশুহত্যা করে যে— কসাই
যে আধারে শব দেহ রেখে কবর দেওয়া হয়— কফিন। সৎ কুলে জাত— কুলীন।

আকাশে চরে যে— খেচর। যে খায়— খাদক।
অপরাধের তথ্য জানবার জন্য গৃহাদি অনুসন্ধান— খানাতল্লাসি। মাথার টাক— খলতি।
খ-কে দ্যুতিময় করে যে— খদ্যোৎ। গুড় দিয়ে পচানো তামাক— খামিরা।

ঘাম ঝরছে এমন— গলদঘর্ম। মিলের অভাব--- গরমিল।
গিন্নির মতো ভাব— গিন্নিপনা। গুরুর বাসগৃহ— গুরুকুল।

আগামী

সুকান্ত ভট্টাচার্য
১৯২৬—১৯৪৭

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই— জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো : হানো যদি কঠিন কুঠারে
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।।

কবিপরিচিতি



কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রাম। পরে তাঁদের কয়েকজন মাদারিপুর গ্রামে বাস করেন। কবি সুকান্তের জন্ম হয় ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট। কবির বাবার নাম ছিল নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মায়ের নাম ছিল সুনীতি দেবী। অতি অল্প বয়সে ক্ষয়রোগে ১৯৪৭ সালের ১৩ মে কবির মৃত্যু হয়। মাত্র তিন মাসের জন্য কবি তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিদেশী শাসনমুক্ত ভারত রাষ্ট্র দেখে যেতে পারেননি। কবির শৈশব কেটে ছিল বাগবাজারের নিবেদিতা লেনে মামার বাড়িতে। পরে বেলেঘাটায় হরমোহন ঘোষ লেনে নিজেদের বাড়িতে। এখানেই তাঁর শৈশব শিক্ষার সূচনা। তিনি বার বার অসুস্থ হয়ে পড়তেন বলে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেননি। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দরিদ্র-নিপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সহানুভূতি। তিনি তাঁর দাদা মহাশয়ের নিকট পেয়েছিলেন কুসংস্কার বিরোধী মনোভাব এবং দিদিমার নিকট পেয়েছিলেন গরিব-দুঃখীর প্রতি মমত্ববোধ -শক্তি। অল্প বয়সেই কবির কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। অনেকে কবি সুকান্তকে 'কিশোর কবি' এবং বিপ্লব ও বিদ্রোহের কবি বলে অভিহিত করেছেন। কবির কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ছাড়পত্র' , 'ঘুম নেই', 'মিঠে কড়া' প্রধান। আলোচ্য "আগামী" কবিতাটি কবির 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

'আগামী' কবিতাটিতে কবি শোষণমুক্ত সমাজ এবং জাতীয় সংহতি ঐক্যবোধ ও সমাজের ক্লিষ্ট তাপিত মানুষের কল্যাণের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কবিতায় কবির সামাজিক একতাবোধ, ত্যাগ ও সংহতির অতীব সুন্দর মনোভাব ফুটে উঠেছে। তাই পাঠটি বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শব্দার্থ

ভীরু— ভয়কাতর/ ভয়াতুর। সংহত— একতাবদ্ধ। আহ্বানে— ডাকে। আগামী— পরবর্তী/ ভাবী। কিশলয়— নবপল্লব/ কচিপাতা। নগণ্য— তুচ্ছ, সামান্য। বনস্পতি— বিশাল গাছ। কূজন— পাখির ডাক। ক্ষুদ্র— ছোট। সম্বর্ধনা— অভ্যর্থনা/ সম্মান প্রদর্শন। সন্দিগ্ধ— সন্দেহযুক্ত। বিদীর্ণ— খণ্ডিত। মুখরিত— ধ্বনিত/বাণীময়। দৃপ্ত— গর্বিত/ বলিষ্ঠ। বিস্মিত— অবাক/ চমকিত

পাঠের জ্ঞাতব্য বিষয়

'আগামী' কবিতাটিতে একটি ছোট্ট বালকের বড় হয়ে ওঠার মহৎ আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন প্রকাশ পেয়েছে। বালকটি বুঝতে পেরেছে যে সে জড় নয়; মৃত নয় এবং নয় সে খনির নিষ্প্রাণ পদার্থ। তার মধ্যে জীবন-প্রাণের বীজ রয়েছে। সে যেন প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে অনুভব করছে, এখন সে সবেমাত্র অঙ্কুরিত এক বীজ মাত্র। সদ্য এ অঙ্কুরিত বীজ জল, হাওয়া মাটি এবং আলোকের স্পর্শ পেয়ে একদিন মহা মহিরুহে পরিণত হবে। তখন সে আর ক্ষুদ্র থাকবে না, তার অন্তরে তখন এক বিশাল চেতনা দেখা দেবে। এখন হয়তো সে বৃহতের মাঝে অতি নগণ্য ও তুচ্ছ বালক, তবুও তার ক্ষুদ্র শরীরে গোপনে বড়ো হবার এক বিরাট সম্ভাবনা পোষণ করছে। যেদিন সে বড় হবে তখন সে আগামী কোনো এক বসন্তে মিশে যাবে বৃহতের দলে। তখন হয়তো বর্তমানের কিশলয়কে সকলে সম্বর্ধনা জানাবে। যদিও সে ক্ষুদ্র বালক মাত্র তবুও তুচ্ছ নয়, সে এক ভাবী সু-নাগরিক। সেদিন সে সমাজের সকলের মনের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার দূর করে, খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখপীড়িত অবস্থা এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষকে শোষণমুক্ত হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। কবিতাটিতে কবির প্রতিবাদী

কণ্ঠের দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে। বড় হয়ে সে মানুষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দেবে। তখন সমাজের উচ্চনীচ ভেদে সকলেই তার আপন জন হবে।

ক্রিয়াকলাপ

১. **শুদ্ধ উত্তরটি লেখো —**

(ক) 'আগামী' কবিতাটির কবি কে?

(১) নজরুল, (২) শঙ্খ ঘোষ, (৩) সুকান্ত ভট্টাচার্য, (৪) মধুসূদন দত্ত

(খ) কবি সুকান্তের জন্ম সাল কত?

(১) ১৯২৫, (২) ১৯২৬, (৩) ১৯১৯, (৪) ১৯৪৭ সাল

(গ) কবি সুকান্ত কত সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিলেন?

(ক) ১৯৩০ সালে (খ) ১৯৪৫ সালে (গ) ১৯৪৭ সালে (ঘ) ১৯৫০ সালে।

(ঘ) কবি কত মাসের জন্য তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি দেখে যেতে পারেননি?

(ক) ৪ মাস (খ) ৫ মাস (গ) ২ মাস (ঘ) ৩ মাস।

(ঙ) কবি সুকান্তের মায়ের নাম কী ছিল?

(ক) সুনীতি দেবী (খ) মায়াদেবী (গ) ছায়াদেবী (ঘ) করুণা দেবী

২. **শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও —**

(ক) ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই— জানি আমি ভাবী——,

(খ) জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের —— খনিজ,

(গ) সংহত কঠিন ঝড়ে —— প্রত্যেক শিকড়।

(ঘ) মেলেছি —— চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে,

(ঙ) বৃষ্টির, —— পাই আমি তারি তো সম্মতি।

৩. **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন —**

(ক) আগামী কবিতাটির রচয়িতা কে?

(খ) কত সালে কবি সুকান্ত মৃত্যুবরণ করেন?

(গ) কবি সুকান্তের পিতা ও মাতার নাম কী ছিল?

(ঘ) কবি সুকান্ত কোন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন?

(ঙ) কবির শৈশবকাল কোথায় কেটেছিল?

(চ) কবি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান?

(ছ) কবি সুকান্ত কার কাছে কুসংস্কার-বিরোধী মনোভাব পেয়েছিলেন?

(জ) কবি সুকান্ত দিদিমার নিকট থেকে কী শক্তি আহরণ করেছিলেন?

(ঝ) অঙ্কুরিত বীজ কীসের প্রতীক?

(ঞ) অনেকের কাছে কবি সুকান্ত কী কবি বলে অভিহিত?

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।**

(ক) কবিতাটিতে কবি কীসের সম্ভাবনার কথা বলেছেন?

(খ) কবিতায় অঙ্কুরিত বীজটির অন্তরে কীসের স্বপ্ন ফুটে উঠেছে?
(গ) অঙ্কুরিত বীজটি বড় হয়ে কী করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?
(ঘ) 'ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই'— কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখো।
(ঙ) কবিতাটির মর্মার্থ সংক্ষেপে ব্যক্ত করো।

৫. **রচনাধর্মী উত্তর লেখো।**
(ক) আগামী কবিতায় কবির বক্তব্য বিষয় আলোচনা করো।
(খ) কবিতাটির সারাংশ লেখো।
(গ) কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
(ঘ) "ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখির কূজন,
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপন জন।'—উদ্ধৃত কবিতাংশের কবির বক্তব্য আলোচনা করো।

৬. **তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**
(ক) তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে
(খ) বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
(গ) শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।

৭. **টীকা লেখো।**
সুকান্ত ভট্টাচার্য, বনস্পতি

৮. **ভাষা-ব্যাকরণ**
ক) সন্ধি বিশ্লেষণ করো।
জীবন্ত = জীব + অন্ত। সংহত = সম +হত। বনস্পতি = বনঃ +পতি।
প্রত্যেক = প্রতি + এক। নয়ন = নে + অন।
চলন্ত, ঘুমন্ত, শয়ন, নীরেন্দ্র, সমরেন্দ্র, কটূক্তি, গণেশ।

(খ) পদ পরিবর্তন করো।
কঠিন— কাঠিন্য
জড়— জড়তা
ভীরু— ভীরুতা
অরণ্য— আরণ্যক
বিস্মিত— বিস্ময়, বিস্ময়াপন্ন
শরীর— শরীরী, শারীরিক
নিজে করো— গোপন, বিশাল, মুখরিত, পুষ্ট, সম্বর্ধনা, রস, খনিজ, আকাশ।

(গ) বিপরীত শব্দ লেখো।
অন্ধকার— আলো
মৃত— জীবন্ত, জীবিত
ভীরু— সাহসী
ক্ষুদ্র— বিশাল, বৃহৎ
নিজে করো— বিশাল, সম্মতি, বিনাশ, বন্ধু, চেতন, গোপন

(ঘ) বাক্সংহতি বা বাক্-সংকোচন করো।
যাহা বেঁচে আছে— জীবন্ত।
আগে জন্ম যার— অগ্রজ।
যাহা নিবারণ করা যায় না— অনিবার্য।
যাহা বিনাশ হবে— নশ্বর
পতিপুত্রহীন নারী— অবীরা।
ভিক্ষার অভাব— দুর্ভিক্ষ।
মমতা নাই যার— নির্মম।
যাহা হতে পারে না— অসম্ভব।
অল্প কথা বলে যে— মিতভাষী।
যাহা বলার যোগ্য নহে— অকথ্য।
হরিণের চামড়া— অজিন।
যে নারীর সন্তান হয় না— বন্ধ্যা।

ঙ. বাক্য-বিবর্ধন বা সম্প্রসারণ

এক বা ততোধিক পদ সহকারে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশকে বর্ধিত বা প্রসারিত করা যায়। যথা—

বালকটি আসিয়াছিল।

সেই বালকটি কাল আসিয়াছিল।

সেই দরিদ্র বালকটি কাল এখানে আসিয়াছিল।

সেই পিতৃহীন দরিদ্র বালকটি কাল কাঁদিতে কাঁদিতে এখানে আসিয়াছিল।

যে পদ বা পদসমষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্যটি বর্ধিত ও প্রসারিত হয়, তাকে বলে উদ্দেশ্যের প্রসারক (Adjuncts to the Subject)।

আবার, যে পদ বা পদসমষ্টি দ্বারা বিধেয়কটি প্রসারিত হয়, তাকে বলে বিধেয়ের প্রসারক (Adjuncts to the Predicative Verb)।

বিধেয়টি ক্রিয়াপদ, সুতরাং বিধেয়ের প্রসারকটি ক্রিয়া-বিশেষণ বা তৎস্থলীয় পদ বা পদসমষ্টি হবে।

যেমন—তিনি 'তাড়াতাড়ি' চলিয়া গেলেন।

তিনি কারও অপেক্ষা না-করিয়া অতি শীঘ্র চলিয়া গেলেন।

পদসমষ্টি বা উপাদান-বাক্যের একপদে পরিবর্তন।

অন্য দেশ—দেশান্তর। অমৃতের ন্যায় মধুর—অমৃতমধুর। অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা— অনুসন্ধিৎসা। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না যে— অবিমৃশ্যকারী। অতিশয় শীতও নয় উষ্ণও নয়— নাতিশীতোষ্ণ। অনায়াসে যাহা পাওয়া যায়— অনায়াসলভ্য। অল্প কথা বলে যে— মিতভাষী। অপত্য হইতে বিশেষ না করিয়া— অপত্যনির্বিশেষে। অন্য বিষয়ে মন যাহার— অন্যমনস্ক। আমিষের অভাব— নিরামিষ। আকাশে উড়িয়া বেড়ায় যে— খেচর। আপনাকে কৃতার্থ মনে করে যে— কৃতার্থস্মন্য। আপাতত মধুর যাহা— আপাতমধুর। আমার তুল্য— মাদৃশ। আদরের সহিত— সমাদরে। ইহার তুল্য— ঈদৃশ। ইতিহাস জানে যে— ঐতিহাসিক। উপায় নাই যার— নিরুপায়। যার শত্রু (জন্মে) নাই— অজাতশত্রু। একই গুরুর বা তীর্থের শিষ্য— সতীর্থ। একই সময়ে বর্তমান— সমসাময়িক।

বাক্য-সম্প্রসারণ (Expansion of Sentences)

উপরি-উক্ত অনুচ্ছেদের দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হবে যে একটি বাক্যের অন্তর্গত কোন একটি বা একাধিক পদ বা পদসমষ্টিকে উপাদান-বাক্যে পরিবর্তিত করে বাক্য-সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এটা বাক্য-সংকোচনের বিপরীত প্রক্রিয়া। যথা—

(১) অনধিকার চর্চা দূষণীয়— যে বিষয়ে অধিকার নাই তাহার চর্চা করা দূষণীয়।

(২) নির্দিষ্ট কার্য শেষ করিয়া অন্য কার্য করিবে— যে কার্য নির্দিষ্ট আছে তাহা শেষ করিয়া অন্য কার্য করিবে।

(ঙ) **বাক্য সম্প্রসারণ করো—**

পাঞ্চজন্য— ভগবান বিষ্ণুর শঙ্খ।

খেচর— যে আকাশে উড়ে বেড়ায়।

অনুজ — পরে জন্মগ্রহণ করেছে যে।

সহোদর— একই মায়ের পুত্র।

অজিন— হরিণের চামড়া।

আকণ্ঠ — কণ্ঠ পর্যন্ত।

অনুক্ত— যা বলা হয়নি।

অভূতপূর্ব— যাহা পূর্বে কখনও হয়নি।

আত্মকথা

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮১৭—১৯০৫

দিদিমার মৃত্যুর পর একদিন আমার বৈঠকখানায় বসিয়া আমি সকলকে বলিলাম যে, "আমি আজি কল্পতরু হইলাম; আমার নিকটে আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা কিছু চাহিবে, তাহাকে আমি তাহাই দিব।" আমার নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না, কেবল আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজবাবু বলিলেন যে, "আমাকে ঐ বড় দুইটা আয়না দিন্, ঐ ছবিগুলান্ দিন্ ঐ জরির পোশাক দিন্।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সকলই দিলাম। তিনি পর দিন মুটে আনিয়া বৈঠকখানার সমস্ত জিনিস লইয়া গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল, আর আর বহুমূল্য গৃহসজ্জা ছিল, সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন।

এইরূপে আমার সকল আস্‌বাব বিলাইলাম। কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ, সেই বিষাদ! তাহা আর ঘুচে না। কীসে শান্তি পাইব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক এক দিন কৌচে পড়িয়া ঈশ্বরবিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম যে, কৌচ হইতে উঠিয়া, ভোজন করিয়া, আবার কৌচে কখন পড়িলাম, তাহার আমি কিছুই জানি না; আমার বোধ হইতেছিল যেন আমি বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছি।

আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটি খুব নির্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না; পার্থিব ও স্বর্গীয়, সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্যের কিরণ-রেখা-সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময় আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটি বাহির হইল,— "হবে, কি হবে দিবা-আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।" এই আমার প্রথম গান। আমি সেই সমাধিস্তম্ভে বসিয়া একাকী এই গানটি মুক্তকণ্ঠে গাইতাম।

তখন সংস্কৃত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। সংস্কৃত ভাষার উপর আমার বালক-কালাবধিই অনুরাগ ছিল; চাণক্যের শ্লোক যত্নপূর্বক তখন মুখস্থ করিতাম; কোনো একটি ভাল শ্লোক শুনিলে অমনি তাহা শিখিয়া লইতাম। তখন আমাদের বাটীতে একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম কমলাকান্ত চূড়ামণি; নিবাস বাঁশবেড়ে। তিনি অগ্রে গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিলেন; পরে আমাদের হন। তিনি সুপণ্ডিত ও তেজস্বী। আমার বয়স তখন অল্প; তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। একদিন বলিলাম, "আমি আপনার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িব।" তিনি কহিলেন, "ভালই তো, আমি তোমাকে পড়াইব।" তখন চূড়ামণির নিকট মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করিলাম, এবং "ঝ ঢ় ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব," কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলাম। সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ হইবার জন্য, চূড়ামণির নিকট আমার মুগ্ধবোধ পড়িবার প্রথম উৎসাহ।

একদিন চূড়ামণি তাঁহার হাতের লেখা একখানি কাগজ আস্তে আস্তে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন;

কহিলেন, "এই লেখাতে সহি করিয়া দেও।" আমি বলিলাম, "কী লেখা?" পড়িয়া দেখি, তাহাতে লেখা আছে যে, তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণকে চিরকাল আমায় প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি তাহাতে তখনি সহি করিয়া দিলাম। চূড়ামণির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। তিনি বলিলেন, আর আমি অমনি তাহাতে সহি করিয়া দিলাম; তাহার বিষয় আমি তখন কিছুই প্রণিধান করিলাম না।

কিছু দিন পরে আমাদের সভাপণ্ডিত চূড়ামণির মৃত্যু হইল। তখন শ্যামাচরণ আমার সেই স্বাক্ষরটুকু লইয়া আমার নিকট আসিলেন। কহিলেন যে, 'আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি নিরাশ্রয়; এখন আপনার আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দেখুন, আপনি পূর্বেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন।' আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইলাম, এবং তদবধি শ্যামাচরণ আমার নিকটে থাকিতেন।

সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঈশ্বরের তত্ত্বকথা কীসে পাওয়া যায়?' তিনি কহিলেন, "মহাভারতে।" তখন আমি তাঁহার নিকট মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রন্থ খুলিবামাত্র একটি শ্লোক আমার চক্ষে ঠেকিল। তাহা এই—

"ধর্মে মতি র্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং,"

তোমাদের ধর্মে মতি হউক, তোমরা সতত ধর্মে অনুরক্ত হও, সেই এক ধর্মই পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধু; অর্থ ও স্ত্রীদিগকে নিপুণরূপে সেবা করিলেও তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যায় না, এবং তাহাদের স্থিরতাও নাই। — মহাভারতের এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া আমার বড়ই উৎসাহ জন্মিল।

আমার সংস্কার ছিল যে, সকল ভাষাতেই বাংলা ও ইংরাজি ভাষার ন্যায় বিশেষ্যের অগ্রে বিশেষণগুলি থাকে। কিন্তু সংস্কৃতে দেখিলাম যে, বিশেষ্য এখানে, বিশেষণ সেই-সেখানে। এইটি আয়ত্ত করিতে আমার কিছু দিন লাগিয়াছিল।

আমি এই মহাভারতের অনেক অংশ পাঠ করি। ধৌম্য ঋষির উপাখ্যানে উপমন্যুর গুরুভক্তির কথা আমার বেশ মনে পড়ে। এখন তো ঐ বৃহৎ গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া অনেকের পাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু তখনকার কালে ঐ মূল গ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিত। আমি ধর্মপিপাসায় উহার অনেকাংশ পাঠ করি।

এক দিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপর দিকে ইংরাজি। আমি ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব, সেই অভাব। তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল। ভাবিলাম, "প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। অগ্নি, স্পর্শমাত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে; যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ?"

আবার ভাবিলাম, "যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্যকিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর একটা অবভাস হয়। ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞানলাভের আর কি উপায় আছে? ইউরোপের দর্শনশাস্ত্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল। একজন নাস্তিকের নিকট এইটুকুই যথেষ্ট; সে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু আমি ইহাতে কীরূপে তৃপ্ত হইব? আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য; অন্ধবিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বাড়িতে লাগিল। এক এক বার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না।

(সংক্ষেপিত)

লেখক পরিচয়



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর জন্ম। তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁর পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং মাতা দিগম্বরী দেবী। গৃহশিক্ষা সমাপ্তির পর রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে কিছুকাল পড়াশুনা করে পিতার সম্পত্তি রক্ষা এবং দর্শন চর্চা করেন। ১৮৩৮ সালে পিতামহীর মৃত্যুতে তাঁর মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি ধর্ম বিষয়ে আগ্রহী হয়ে দর্শন উপনিষদ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে নিমগ্ন হলেন। ১৮৩৯সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্বরঞ্জনী সভা' পরে যার নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। ১৮৪২ সালে ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম ব্রহ্মোপাসনা রীতি প্রচলন করেন। দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তিও বহু সমাদৃত। ১৮৪৮ সালে তিনি ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয় আত্মতত্ত্ববিদ্যা। ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে মহর্ষি উপাধি দান করে। ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি মহর্ষি ইহলীলা ত্যাগ করেন।

পাঠ-প্রসঙ্গ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মকথায়' জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর আধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে জড়িত। দেবেন্দ্রনাথের দয়াপরবশ চিত্তের কথা আমরা জানি। লেখক এখানে কমলাকান্ত চূড়ামণির পুত্রের প্রতিপালনে যে দায়িত্ব বহন করলেন, তা একটা অঙ্গীকার।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ আত্মার শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি মহাভারত এবং য়ুরোপের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হলেন। তাঁর চেষ্টা ছিল জ্ঞানের আলোকে ঈশ্বরের অনুসন্ধান।

এই পাঠে শিক্ষার্থীরা ত্যাগধর্মের, সত্যবাদিতার কথা অবগত হবে। এবং তাদের জীবনাচরণে সত্য ও ত্যাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে। তা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যানুরাগ নবীন শিক্ষার্থীর প্রেরণার স্থল।

শব্দার্থ

বৈঠকখানা — মজলিস ঘর, বহির্বাটিতে বসবার ঘর।

কল্পতরু — আকাঙ্ক্ষা তরু। সর্বকামনা পূরণকারী বৃক্ষ বিশেষ।

জ্যেষ্ঠতাতপুত্র — জেঠা মশাইয়ের ছেলে।

তৎক্ষণাৎ — হঠাৎ, তক্ষুনি।

মুটে — মোট বা বোঝা বহনকারী, মজুর।

আসবাব — উপকরণ, জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জিনিস, তৈজস সত্র।

ঘুচে না — মোছে না, চোকে না, শেষ হয় না।

কৌচে — আরাম করে বসবার আসবাব।

বরাবর — সবসময়, প্রতিনিয়ত, একইভাবে।

প্রহর — তিনি ঘণ্টা সময়; কাল গণনার সাবেক একক।

নির্জন — জনতা হীন, জনহীন, লোকমানব শূন্য, জনমানব শূন্য।

সমাধিস্তম্ভ — সমাধির স্মারক, মৃতব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত স্মারক।

বিষয় — বিষয়-আশয়, টাকা-পয়সা-সা-সম্পত্তি।

প্রলোভন — লোভ, আসক্তি, বাসনা।

মুক্তকণ্ঠে — খোলা গলায়; আড়ষ্টহীন স্বরে।

বাটী — বাড়ি, গৃহ, আবাস, নিবাস।

আশ্রয়ে — অবলম্বনে, শরণে, সহায়ে।

সুপণ্ডিত — বিদ্বান, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী।

তেজস্বী — তেজদীপ্ত, প্রখর, বুদ্ধিসম্পন্ন।

উৎসাহ — উদ্দীপনা, বিশেষ আগ্রহ।

সহি — দস্তখত, সই, নাম সই করা।

প্রণিধান — ধ্যান, সমাধি, অর্পণ, অভিনিবেশ।

নিরাশ্রয় — আশ্রয়হীন, যার কোনো আশ্রয় নেই।

প্রতিপালন — লালন-পালন, দেখ-ভাল, ভারণ-পোষণ।

অঙ্গীকার — প্রতিজ্ঞা, বাগ্‌দান।

তদবধি — তখন থেকে, সেই সময় থেকে।

ঠেকিল — বাধাপ্রাপ্ত হল, বাধা পেল, আটকে গেল।

অধিকার — দখল, আয়ত্ত।

মতি — নিষ্ঠা, মনের প্রস্তুতি, আগ্রহ, মনোযোগ।

অনুরক্ত — প্রীত, আসক্ত।

পরলোকগত — যিনি দেহত্যাগ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন, বৈকুণ্ঠগামী।

নিপুণরূপে — সুকৌশলে, দক্ষভাবে।

স্থিরতা — অচঞ্চলতা।

সংস্কার — মানসিক বিশ্বাস।

ধর্মপিপাসা — ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা, আগ্রহ, কৌতূহল, তৃষ্ণা।

ভস্মসাৎ — ভস্মে পরিণত।

ঘূর্ণাবর্ত — ঘূর্ণি, আবর্ত, ঝড়, ঝঞ্ঝা।

বিষম — সাংঘাতিক।

বিপাক — বিপদ।

টীকা

গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬০—১৮১৯)

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশের দ্বিতীয় পুরুষ। ইংরাজি, ফরাসি, পর্তুগিজ, সংস্কৃত, ফারসি ও উর্দু ভাষা জানতেন। ... সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রসারকল্পে হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খ্রি. ২০ জানুয়ারি) ... তৎকালীন দশ হাজার টাকা দান করেন এবং হিন্দু কলেজের বংশানুক্রমিক গভর্নর পদ লাভ করেন। সংস্কৃত

চর্চায় উৎসাহী ছিলেন এবং সংগীতজ্ঞ, ব্যায়ামবীর প্রভৃতির সমাদর ও প্রতিপালন করতেন। প্রসন্নকুমার ঠা... কনিষ্ঠ পুত্র।

চাণক্য

চাণক্যের আর এক নাম কৌটিল্য। পণ্ডিতগণ চাণক্যকে ভারতের মেকিয়াভেলি মনে করেন। কৌটি... 'অর্থশাস্ত্র' সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থখানি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের (২০১-৩০০ খ্রিস্টাব্দ) কোনো এক সময়ে রচিত এবং প্রসিদ্ধ। চাণক্যের শ্লোক এখনো জনমানসে বহুল প্রচারিত।

যেমন— উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।।

চাণক্যের আর এক নাম বিষ্ণু গুপ্ত। চাণক্য মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের উচ্ছেদ সাধন করে মৌর্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় তিনি মন্ত্রীপদে বৃত হয়েছিলেন।

বোটানিক্যাল গার্ডেন

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট কিড নামে এক ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনা আধিকারিক এই উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গাছপালা এনে সেগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যে কলকাতার অদূরে হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে কিছু জলাজমি ক্রয় করে এই উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিরা এই উদ্যান তৈরি করেছিলেন বলে লোকমুখে এর নাম হয় কোম্পানি বাগান। ১৭৮৭ থেকে১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবার্ট কিড এই উদ্যানের সাম্মানিক সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। বর্তমানে এই উদ্যানের নাম আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেন।

মুগ্ধবোধ

সংস্কৃত বৈয়াকরণ বোপদেব গোস্বামী রচিত বিখ্যাত ব্যাকরণ।

ধৌম্য ঋষির উপাখ্যান

মহর্ষি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ধৌম্য। উৎকোচক তীর্থে তাঁর সঙ্গে পাণ্ডু-পুত্র অর্জুনের সাক্ষাৎ হয়। অর্জুনের প্রার্থনায় তিনি পাণ্ডবদের পৌরহিত্যে ব্রতী হন। কথিত আছে যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্মিত সভায় উপস্থিত ঋষিদের অন্যতম ছিলেন ধৌম্য। লঙ্কা-সমর বিজয়ী রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করার জন্য তিনি অযোধ্যা গমন করেন।

উপমন্যু

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের অন্যতমা পত্নী পীবরীর গর্ভে উপমন্যু জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি বশিষ্ঠ বংশীয়। মহর্ষি আয়ুধধৌম্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন উপমন্যু। একদিন উপাধ্যায় তাঁকে বললেন, বৎস উপমন্যু সাবধানে আমার গো-ধন রক্ষা কর। এই বলে তাঁকে গোচারণে পাঠালেন। উপমন্যু গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে গোচারণে গেলেন। ধীরে ধীরে গুরু তাঁর আহার রদ করলেন। তবুও শিষ্যকে পুষ্ট দেখে জানতে চাইলেন, এখন তুমি কী ধরনের আহার গ্রহণ করছ। উপমন্যু উত্তর করলেন, ভগবান! আমি এখন ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছি। তা শুনে উপাধ্যায় বললেন, আমাকে না-জানিয়ে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আহার করা তোমার উচিত হয়নি।

উপমন্যু গুরুর নির্দেশ মান্য করে ভিক্ষান্ন আহরণ করে গুরুকে প্রত্যর্পণ করতেন। উপাধ্যায় সেই ভিক্ষান্ন

সমুদায় গ্রহণ করতেন। উপমন্যুকে খাবার জন্য কিছুই দিতেন না। এভাবে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উপমন্যু দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন।

প্রশ্নাবলি

১. **দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদিমার নাম কী ছিল? (সঠিক উত্তর নির্বাচন করো)**

ক. মেনকাসুন্দরী খ. অলকাসুন্দরী

গ. সারদাসুন্দরী ঘ. দিগম্বরী

২. **ব্রজবাবু কে?**

৩. **দেবেন্দ্রনাথের প্রথম গানটি কী ছিল লেখো।**

৪. **তোমার জ্ঞাত একটি চাণক্য শ্লোক উল্লেখ করো।**

যেমন— বৃত্তেন রক্ষ্যতে ধর্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে। সুনীত্যা রক্ষ্যতে রাজা সদ্‌গৃহীণ্যা তথা কুলম্।।

৫. **দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে যে সভাপণ্ডিত ছিলেন তাঁর নাম কী? (সঠিক উত্তর নির্বাচন করো)**

ক. দেবকান্ত চূড়ামণি খ. শ্যামাচরণ

গ. ব্রজবাবু ঘ. কমলাকান্ত চূড়ামণি

৬. **কমলাকান্ত চূড়ামণির বাড়ি কোথায় ছিল?**

৭. **চূড়ামণির পুত্রের নাম ছিল— (সঠিক উত্তর নির্বাচন করো)**

ক. শ্যামাচরণ খ. বরদাচরণ

গ. কালীচরণ ঘ. ব্রজগোপাল

৮. **দশটি বাক্যে লেখো।**

ধৌম্য ঋষি কে? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখো।

৯. **সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।**

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম বলো।

ক. মেঘনাথ খ. রবীন্দ্রনাথ

গ. দ্বারকানাথ ঘ. গগনেন্দ্রনাথ

২. শ্যামাচরণ দেবেন্দ্রনাথকে পড়তে বলেছিলেন—

ক. রামায়ণ খ. মহাভারত

গ. ভাগবত ঘ. পুরাণ

৩. 'তোমাদের ধর্মে মতি হউক'— এই কথাটি কোন গ্রন্থে আছে।

ক. রামায়ণে খ. ভাগবতে

গ. মহাভারতে ঘ. গীতাঞ্জলিতে

১০. **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।**

ক. 'ভালোই তো আমি তোমাকে পড়াইব' — উক্তটি কার?

খ. 'আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে,'— উক্তিটি কার?

গ. দেবেন্দ্রনাথ কীভাবে ঈশ্বরকে লাভ করতে চেয়েছেন?

১১. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

ক. ঈশ্বর লাভের জন্য দেবেন্দ্রনাথ কী কী করলেন?

খ. কমলাকান্ত চূড়ামণির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক কেমন ছিল?

গ. ঈশ্বরের তত্ত্বকথার হদিস দেবেন্দ্রনাথ কার নির্দেশে কোথায় পেয়েছিলেন?

১২. দশটি বাক্যে উত্তর দাও।

ক. 'কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ, সেই বিষাদ!' — উক্তিটি কার? তাঁর এমন বিষাদের কারণ ব্যাখ্যা করো।

খ. কমলাকান্ত চূড়ামণির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিবরণ দাও।

গ. দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর অন্বেষণে কী কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন?

ঘ. উপমন্যুর কথা কোন গ্রন্থে আছে? উপমন্যুর কথা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

১৩. রচনাধর্মী উত্তর লেখো।

ক. দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্ম সাধনার কথা বর্ণনা করো।

খ. অন্তরের বিষাদ ভাব দূর করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা বর্ণনা করো।

গ. ধৌম্য ঋষির উপাখ্যান তথা উপমন্যুর গুরু ভক্তির কথা যা জান লেখো।

১৪. শব্দছকে উপরনীচে বর্ণমালা বসিয়ে শব্দ তৈরি করো।

যেমন— আমবাগান। এবার দেখো পাশাপাশি আর কী শব্দ তৈরি হল। সেগুলো লেখো।

মু	জ	ত	বা	আ	লী

ভারতবর্ষ

এস. ওয়াজেদ আলী
১৮৯০—১৯৫১

পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি কোলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চারপাশে তার ধবধবে সাদা চুল; নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা; গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফ শূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞলোকের মতো চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক এক বার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পাঠ শুনত, আবার খদ্দের এলে, গিয়ে তাদের দেখাশুনা করত। আমারই বয়সি একটি ছেলে,খালি গায়ে বুড়োর কাছে সর্বদা বসে থাকত। আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হত বিষয়টি তারা বিশেষ ভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হল। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কী করে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেদের মুখ আনন্দ আগ্রহ আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম, তখন কেউ-না কেউ এসে আমায় ডেকে নিয়ে যেত। সেতু বাঁধা হচ্ছিল তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কিনা, আর পার হয়েই বা কী করেছিলেন, তা তখন জানতে পারিনি।

দু-চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তারপর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম তার ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোনো গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল! তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম। এমন কত শত জিনিস রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘর-বাড়ি সব বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড় বড় ম্যান্‌শন (mansion) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু চারটে রিকশা আর ঘোড়ার গাড়িই সে-পথ দিয়ে যেত; এখন বড়ো বড়ো মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আগে মিট্‌মিট্ করে গ্যাসের বাতি জ্বলত; এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। জিনিসপত্র ঠিক আগের মতো সাজানো রয়েছে। চালে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধহয় সেই পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি।

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে। পঁচিশ বছর আগে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর বসে মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ছিল, পঁচিশ বছর আগের সেই মধ্যবয়স্ক

লোকটির মতোই একটি মধ্যবয়স্ক লোক এক এক বার এসে সেই পাঠ শুনছিল আর আবশ্যক মতো খদ্দেরদের দেখা-শুনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেলেটির মতো একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর দিকে চেয়ে বসেছিল। তার পাশে সেই আগেকার মেয়েদের মতো দেখতে দুটি মেয়ে।

কোনো মায়ামন্ত্র বলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এলো নাকি! আমি অবাক্ হয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতু বন্ধনের কথা— পঁচিশ বছর আগেও যা শুনেছিলুম।

আমি আর থাকতে পারলুম না, সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, 'মশায়' মাপ করবেন। ঠিক পঁচিশ বছর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি, আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতু বন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দুটিকে মুছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিল, তারপর বিস্ময়ের স্বরে বললে, পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন? আমি বললুম 'আজ্ঞে হাঁ।' বৃদ্ধ বললে 'তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনত। ছেলেটি এখন ঐ বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতোই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-কন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতি। আর এই মেয়ে দুটি আমার নাতনি— আমার ঐ ছেলের সন্তান।'

বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, 'এ বইটি কবেকার?'

স্মিত হাস্যে বৃদ্ধ বললে, 'এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার, ঠাকুরদাদা বটতলায় এটি কিনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা, আমার তখন জন্ম হয়নি।'

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলাম। মনে হল, আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি। প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে তার কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি।

লেখক পরিচিতি



লেখক এস ওয়াজেদ আলী হুগলি জেলার বড়তাজপুরে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। নিজের দেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আলী সাহেব বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনায় সহজাত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আলী সাহেবের রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ভারতবর্ষ', 'জীবনের শিল্প', 'খেয়ালের ফেরদৌস,' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'ভবিষ্যতের বাঙালী'। এস. ওয়াজেদ আলী মোট কুড়িটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন আলী সাহেব পরলোক গমন করেন। আলোচ্য রচনাটি লেখকের 'মাশুকের দরবার' নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। পাঠটিতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন ধারা ও ঐতিহ্যের এক অদ্ভুত সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাই বর্তমান রচনাটি পাঠ্য সংকলন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সঙ্গে কলকাতার নাগরিক জীবনের বহিরঙ্গ দিকের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাস্তার দুধারে শৃঙ্গের মতো বিশাল বিশাল অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতার প্রাচীন রাস্তায় হাতে টানা রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ির পরিবর্তে রাজপথে চলছে দ্রুতগতির যানবাহন, মোটরগাড়ি, ট্রামগাড়ি আরো কতো কি। পূর্বের রাস্তার ধারে গ্যাসের বাতির স্থানে জ্বলছে বৈদ্যুতিক বাতি। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন সনাতন ধর্মীয় ধারা বা ঐতিহ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তা এখনও চিরাচরিত ধারায় অপরিবর্তিতরূপে চলছে। তাই পিতৃপুরুষানুক্রমে ভারতীয় আদর্শ রামায়ণ মহাভারতের শাশ্বত ধারা-ই উত্তরাধিকার লাভ করে পরবর্তী প্রজন্মের পথ প্রশস্ত করছে।

৩. (ক) ক্রিয়া কলাপ

(১) **লেখক কত বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন?**

(১) বারো-তেরো (২) দশ-এগারো, (৩) এগার-বারো, (৪) নয়-দশ

(২) **বৃদ্ধ সাপ খেলানো সুরে কী পড়ছিলেন?**

(১) মহাভারত (২) গীতা, (৩) চণ্ডী, (৪) রামায়ণ

(৩) **বৃদ্ধের ঠাকুরদা কোথায় 'রামায়ণ' গ্রন্থটি কিনেছিলেন?**

(১) তালতলায় (২) বটতলায়, (৩) আমতলায় (৪) বেলতলায়

(৪) **কত বছর পূর্বে লেখক কলকাতায় এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন?**

(১) পনেরো বছর (২) কুড়ি বছর (৩) পঁচিশ বছর, (৪) তিরিশ বছর।

(খ) **শূন্যস্থান পূর্ণ করো।**

১। আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম—দৃশ্য দেখে।

২। বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে—সুরে কি পড়তো।

৩। নাকের উপর মস্ত-—চশমা।

৪। আমার ঠাকুরদাদা — এটি কিনেছিলেন।

৫। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমায় — একবার ভালো করে দেখে নিল।

(গ) **শুদ্ধ-অশুদ্ধ বেছে বের করো।**

১। এই সেদিন দৈবক্রমে ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।

২। সেতু বাঁধা হচ্ছিল তাই আমি শুনেছিলুম।

৩। বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হল।

৪। বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলাম।

৫। ঠিক পঁচিশ বছর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি।

(ঘ) **বাক্য রচনা করো।**

শুনতে শুনতে, বেড়াতে বেড়াতে, মিটমিট, আপাদমস্তক, স্মিতহাস্যে, দিব্যচক্ষু, অভিবাদন, Tradition (ঐতিহ্য) অবশ্যম্ভাবী, বিপুলকায়, ক্রিয়াকাণ্ড, ঘরকন্না, দৈবক্রমে।

(ঙ) **বাক্য সংকোচন করো —**

বৃহৎ আকারের— বিপুলকায়

শব্দার্থ

বিপুলকায়— অতিকায়, খুব বড়। শ্মশ্রুগুম্ফ— দাড়ি, গোঁফ। কৌতূহল— আগ্রহ, জানার ইচ্ছা। ক্রিয়াকাণ্ড— কার্যকলাপ। বিজ্ঞ— জ্ঞানী। দৈবক্রমে— হঠাৎ, দেবতার ইচ্ছা অনুসারে। ম্যানশন— বৃহৎ অট্টালিকা। অবশ্যম্ভাবী— যাহা ঘটবেই। খদ্দের— ক্রেতা। খুঁট্‌— বস্ত্রের প্রান্তভাগ, আঁচল। অভিবাদন— কুর্নিশ, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন। আপাদমস্তক— পা থেকে মাথা পর্যন্ত। দিব্যচক্ষু— অলৌকিক দৃষ্টি।

শব্দার্থ লেখো : নিজে করো।

নিখুঁত, স্তম্ভিত, অস্তিত্ব, অপূর্ব, কপিসেনা, মুদিখানা, মিটমিট, স্মিতহাস্যে

১. টীকা

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ নাম কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে আনুমানিক ১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল বনমালী ওঝা এবং মাতার নাম মণিকা। মতান্তরে মেনকা। কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণের শ্রুতিমধুর বাংলা পদ্যানুবাদ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজও বাঙালির প্রিয়তর গ্রন্থ।

বটতলা

কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলের একটি স্থান। উনিশ শতকের বাংলা পুস্তক-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। বিশেষ করে বাংলা 'চটি বই' বটতলার দান। এই বইগুলোতে কোনো মলাট বা প্রচ্ছদ থাকত না। রামায়ণ, মহাভারত এ স্থানে মুদ্রিত হত। এখানেই অল্পমূল্যে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যেত। ইতিহাস, কেচ্চা-কাহিনি, পুরাণ, যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিকম্প, বন্যা, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি প্রায় সবরকমের বই বটতলায় ছাপা হত। বাজার থেকে আশ্চর্যরকম কম দামে বই পাওয়া যেত বটতলায়।

ট্র্যাডিশন

পরম্পরায় চলে আসে এমন চিন্তা বিশ্রুতি বা বিশ্বাস। পরম্পরাগত সংস্কার ভাবধারা ইত্যাদি ঐতিহ্যের অন্তর্গত। ভারতীয় ঐতিহ্যে এ কথা আজ স্বীকৃত যে মহাভারত রচনা করেছিলেন ব্যাসদেব। ইংরেজি ট্র্যাডিশন শব্দের বাংলা রূপ হল ঐতিহ্য। ঐতিহ্য একটা চিরায়ত ব্যাপার।

টীকা : নিজে লেখো— সাপ-খেলানো সুর, রামায়ণ

২. **পাঠের জ্ঞাতব্য বিষয়**

বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই সভ্যতা-সংস্কৃতির এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের ভারতবর্ষের সভ্যতার একান্ত আপন বৈশিষ্ট্য হল— সাধারণ সহজ-সরল মানুষের ধর্মপ্রাণতা। ভারতের মানুষের ধ্যান ধারণা ঐতিহ্য বা Tradition হল এক প্রকার অধ্যাত্মিকতা। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতের মানুষ বংশ পরম্পরায় এ ধারা বা ঐতিহ্য একই ভাবে অপরিবর্তিতরূপে বজায় রেখেছে। কালের পরিবর্তন ও নানা প্রভাবে ভারতীয় সমাজে নানা পরিবর্তনের স্রোত এলেও কিন্তু ভারতীয় জনগণের সহজ সরল মনের ধর্মপ্রাণতা অপরিবর্তিতরূপে রয়ে গেছে। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে

যাহা অবশ্যই ঘটিবে— অবশ্যম্ভাবী

পা হইতে মাথা পর্যন্ত— আপাদমস্তক

ছেলের বা মেয়ের মেয়ে সন্তান— নাতনি।

জানার জন্য বিশেষ আগ্রহ— কৌতূহল।

৪. **প্রশ্নাবলি (ভাববিষয়ক)**

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন —

ক) ভারতবর্ষ পাঠটির লেখক কে?

খ) লেখক কত বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন?

গ) লেখকের বাসার নিকট কী ছিল?

ঘ) 'Tradition' শব্দের অর্থ কী?

ঙ) মুদিখানায় বসে বৃদ্ধটি কী পড়ছিলেন?

চ) লেখকের সামনে কীসের ছবি ফুটে উঠেছিল?

ছ) বিপুলকায় বইটি কে, কোথা থেকে ক্রয় করেছিলেন?

জ) বৃদ্ধের পাঠের বিষয় কী ছিল?

ঝ) বৃদ্ধটি কার লেখা কী বই পড়তেন?

৫. **সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।**

(ক) বৃদ্ধ রামায়ণের কোন অংশ পাঠ করতেন? ছেলে মেয়েদের মনে তার কী প্রতিক্রিয়া ঘটত?

(খ) লেখকের মতে পঁচিশ বছর পর কলকাতায় কী পরিবর্তন হয়েছিল?

(গ) ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবি বলতে লেখক পাঠটিতে কী বুঝিয়েছেন?

(ঘ) লেখক কী দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন?

(ঙ) 'ভারতবর্ষ' রচনাটির মূলভাব কী? মুদিখানা কীসের প্রতীক?

(চ) মুদিখানাটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(ছ) রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কাহিনিটি লেখো।

৬. **রচনাধর্মী উত্তর লেখো।**

(ক) "সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।' কোন প্রসঙ্গে কে এ উক্তি করেছেন? ট্র্যাডিশন কীভাবে সমানে চলছে তা বুঝিয়ে লেখো।

(খ) 'বুড়ো কী পড়ছে তা জানবার জন্য আমার কৌতূহল হল।"—এখানে কার কৌতূহল হল? কৌতূহলের কারণ বিশদ ভাবে আলোচনা করো।

(গ) পঁচিশ বছর পূর্বে এবং পরে লেখকের দেখা কলকাতার বিস্তারিত বর্ণনা দাও?

(ঘ) "প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবি আমার সামনে ফুটে উঠল।"—প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবিটি কী? এর যথাযথ বর্ণনা দাও।

(ঙ) 'ভারতবর্ষ' পাঠটি অনুসরণে বৃদ্ধটির পরিচয় দাও এবং তাঁর রামায়ণ পাঠের দৃশ্যটি বর্ণনা করো।

৭. **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো —**

(ক) এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি? আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি?

(খ) আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি।

(গ) কোনো মায়ামন্ত্র বলে সেই সুদুর অতীত আবার ফিরে এলো নাকি?

(ঘ) আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে।

(ঙ) পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল।

৮. **তাৎপর্য লেখো —**

(ক) তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম।

(খ) মনে হলো আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি।

(গ) এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আমার ঠাকুরদা বটতলায় এটি কিনে ছিলেন।

(ঘ) বোধহয় সেই পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি।

৯. **পাঠ-নির্ভর ব্যাকরণ।**

(ক) **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো —**

আপাদমস্তক— পা হইতে মাথা পর্যন্ত — (অব্যয়ীভাব সমাস)

বিপুলাকায়— বিপুল কায়া যার— (বহুব্রীহি সমাস)

শ্মশ্রুগুম্ফ— শ্মশ্রু ও গুম্ফ— (দ্বন্দ্বসমাস)

ঘরবাড়ি— ঘর ও বাড়ি— (দ্বন্দ্বসমাস)

লঙ্কাদ্বীপ— লঙ্কা নামক দ্বীপ— (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)

নিজে করো — মহাশয়, ঠাকুরদাদা, বটতলা, নিখুঁত, মায়ামন্ত্র, স্বামীপুত্র।

(খ) **পদান্তর করো।**

টাক, উৎসাহ, পরিবর্তন, ত্যাগ, বৃদ্ধ, স্বর্গ, বিস্ময়, গম্ভীর।

(গ) **বাক্য পরিবর্তন করো।**

ওর বয়স আপনার মতোই হবে (অস্ত্যর্থক)

ওর বয়স আপনার চেয়ে কম হবে না (নাস্ত্যর্থক)

সে অনেক দিনের কথা (অস্ত্যর্থক)

সে খুব অল্প দিনের কথা নয় (নাস্ত্যর্থক)

(ঘ) **উক্তি কত প্রকার ও কী কী?**

উ. বক্তা তাঁর শ্রোতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য দু'প্রকারে উপস্থাপিত করতে পারেন। তাই উক্তি দু' প্রকার (১) প্রত্যক্ষ উক্তি এবং (২) পরোক্ষ উক্তি।

উক্তি পরিবর্তন করো —

(১) প্রত্যক্ষ উক্তি — মালা আমাকে বলল, "এখন বিরক্ত করিস না"।

পরোক্ষ উক্তি — মালা আমাকে বলল যে আমি যেন এখন তাকে বিরক্ত না করি।

(২) প্রত্যক্ষ উক্তি —লেখক বললেন, "পঁচিশ বছর পূর্বে আমি কলকাতায় এসেছিলুম"।
পরোক্ষ উক্তি — লেখক বললেন যে তিনি পঁচিশ বছর পূর্বে কলকাতায় এসেছিলেন।

(৩) প্রত্যক্ষ উক্তি — লেখক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন হয়নি"?
পরোক্ষ উক্তি — লেখক বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

(৪) প্রত্যক্ষ উক্তি —গুরু শিষ্যকে বললেন, "তুমি এখন বাড়ি যাও"।
পরোক্ষ উক্তি — গুরু শিষ্যকে এখন বাড়িতে যেতে নির্দেশ দিলেন।

(৫) প্রত্যক্ষ উক্তি — রাম বলল, "আজ আমার যাওয়া হবে না।"
পরোক্ষ উক্তি — রাম জানাল যে সে আজ যেতে পারবে না।

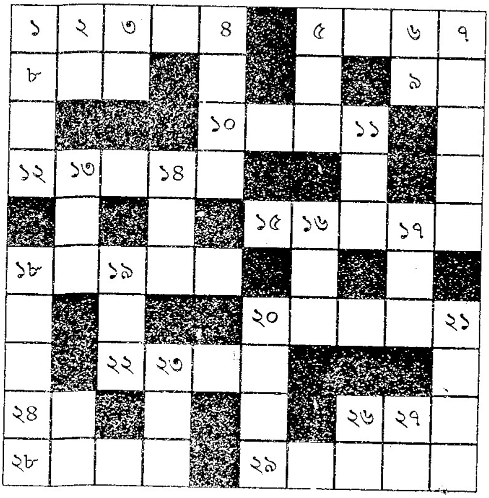
শব্দজাল

সূত্র : পাশাপাশি

১. রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম ৫. সুন্দর মুখ যে নারীর ৮. থেমে থেমে চলা ৯. গৃহীত শ্বাস ১০. সেকালে জমিদার বাড়িতে ঢুকতে হলে যা দিতে হত ১২. গূঢ় তথ্য আবিষ্কার ১৫. দখল, অধিকার ১৮. সবসময় ২০. বিপরীত, অন্যথা ২২. মর্ত্যধাম, পৃথিবী ২৪. রুষ্ট হওয়া, রাগ করা ২৬. রঙ্গরসে পটীয়সী ২৮. অপ্রাপ্তবয়স্ক ২৯. শেষ সময়।

উপরনীচ

১. পথ দিয়ে চলাচলের জন্য খাজনা ২. আনন্দজনক ৩. রূপকথায় বর্ণিত পাখি ৪. রাজাসন ৫. বড় এবং ধীরগামী নৌকা ৬. অজয়, দামোদরকে যা বলা হয় ৭. কোনও কিছুর নাম দেওয়া ১১. নেতা ১৩. হত্যা ১৪. অভ্যন্তর ১৬. খারাপ কাজকে যা জানানো হয় ১৭. মণীন্দ্রলাল বসুর বিখ্যাত উপন্যাস ১৮. কৃতকর্মের জন্য খেদ ১৯. পরনের কাপড় ২০. কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে যে স্বাক্ষর করে ২১. পরলোক ২৩. ইনি ভক্ষক হলেই মুশকিল ২৫. লেবুজাতীয় ফল ২৬. যুদ্ধ ২৭. চার আনা মূল্যের মুদ্রা।



সমাধান।

পাশাপাশি

১. পরশুরাম ৫. বরাননা ৮. থমক ৯. দম ১০. নজরানা ১২. রহস্যভেদ ১৫. অধিকরণ ১৮. অনবরত ২০. বরখেলাপ ২২. নরলোক ২৪. চটা ২৬. রসিকা ২৮. নাবালক ২৯. মরণকাল।

উপর-নীচ

১. পথকর ২. রম ৩. শুক ৪. মসনদ ৫. বজরা ৬. নদ ৭. নামকরণ ১১. নায়ক ১৩. হনন ১৪. ভেতর ১৬. ধিক্কার ১৭. রমলা ১৮. অনুশোচনা ১৯. বসন ২০. বকলম ২১. পরকাল ২৩. রক্ষক ২৫. টাবা ২৬. রণ ২৭. সিকি।

বাংলা বানানবিধি

১. স্বরচিহ্ন স্বচ্ছ হবে। রু, গু, শু, হু, রূ, স্তু, শ্রু, প্রু, ব্রু, ত্রু, প্রূ, হৃ, ভ্রু, দ্রু, সু, নু, গ্রু, গ্রূ।

২. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ হবে। ঙ্ক, ঙ্গ, ঙ্খ, ঙ্ঘ, ক্র, ক্ক, ক্ত, ক্ষ্ম, ঞ্চ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ন্ট, ণ্ট, ন্ড, ণ্ড, ন্ধ, ধ্ন, ন্থ, ম্র, ম্প, স্ক, ম্ন, স্প, স্ব, স্র প্রভৃতি।

৩. (ক) বাংলায় গৃহীত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্য শব্দে ঈ, ঈ-কার, ঊ, ঊ-কার, ঋ-কার হবে না। রাজি, খুশি, নেপালি, জমিদারি, ছেলেমানুষি, রুপো, পুজো, চাকুরিয়া, বাঙালি, ব্রিটেন, খ্রিস্টাব্দ।

(খ) অতৎসম শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয় হলে, প্রত্যয়ের বানান সংস্কৃত নিয়মে হবে। ইয়োরোপীয়, (কিন্তু ইয়োরোপিয়ান— কারণ এটি ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকৃত রূপ) অস্ট্রেলীয়া, লগ্নীকরণ।

(গ) অতৎসম স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে কেবলমাত্র ই-কার। বাঘিনি, নাগিনি, মাসি, পিসি, বুড়ি, ছুঁড়ি, দেমাকি, কাকি, মামি, গয়লানি, মেথরানি প্রভৃতি।

৪. (ক) যেসব সংস্কৃত শব্দে ই অথবা ঈ, কিংবা উ, ঊ-দুই বানানই বিকল্প হিসেবে আছে, সেখানে 'ই' এবং 'উ'-যুক্ত রূপটিই ব্যবহৃত হবে। অবনি, অঙ্কটি, আবলি, অঘোরি, অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গরাখি, অঙ্গুলি, বীথি, অটনি, অটবি, অতিসার, অন্তরিক্ষ, অম্বুরি, উষা প্রভৃতি।

(খ) যেসব সংস্কৃতি শব্দে 'স' ও 'ষ' দুই-ই আছে, সেখানে 'স' লেখা হবে। 'শ' ও 'স' থাকলে 'শ' অগ্নিস্বাত্ত, অভিস্যন্দ, কিশলয়।

(গ) 'ন' ও 'ণ' দুই-ই থাকলে কেবল 'ন'। অঙ্গন, অনুখন, অম্ললোনিকা, মানবক।

৫. (ক) 'কোনো' লেখা হবে। কোনো, কোনোই, কোনোও, কোনোটা, কোনোটাই, কোনোটিও, কোনোদিন, কোনোকালে, কোনোমতে, কোনোভাবে, কোনোক্রমে।

(খ) 'কখনো' লেখা হবে। কখনো, কখনোই, কখনোও, কখনো কখনো।

(গ) যেমন, যেমনই, যেমনি, তেমন, তেমনই এমন, এমনই, অমনি— লেখা হবে, তবে এদের অর্থভেদ আছে। যেমনই (য্যামোনি)। যেমনি (যেম্‌নি) গাছ থেকে নেমেছে অমনি (ওম্‌নি)...। তেমন (ত্যামোন)। তেমন খারাপ কিছু দেখছি না। তেমনই (ত্যামোনি)। যেমন সুশ্রী দেখতে তেমনই সুন্দর কথা। তেমনি (তেমনি)। ...'তেমনি করে গাও গো'। এমন (অ্যামোন্) —'এমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে'। এমনই (অ্যামোনি)। 'এমনই ঊষাকালে'। এমনি (এম্‌নি) — 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না'।

(ঘ) সেখান, সেদিন, সেকাল, সেক্ষেত্রে, সেজন্য, যেখান, যেদিন, সেকালে, যেজন্য, যেক্ষেত্রে, এখান, এদিন, একাল, এবেলা, ওখান, ওদিন, ওজন্য, ওকাল ইত্যাদি ক্ষেত্রে সে, যে, এ, ও যেখানে যথাক্রমে সেই, যেই এই এবং ওই-এর সংক্ষিপ্ত ও কথ্যরূপ সেখানে এদের একসঙ্গে লেখা হবে। এ ছাড়া সেইখান, সেইস্থান, ওইদিন, যেইদিন— প্রয়োজনে একসঙ্গে লেখা যেতে পারে।

(ঙ) আজো, কালো, সেদিনো, এখনো, আজি, এখনি— লেখা হবে না। অর্থাৎ জোর দেওয়ার জন্য 'ও' কিবা 'ই' সর্বক্ষেত্রে আলাদা 'ই' ও 'ও' হয়েই থাকবে, 'ই-কার' অথবা 'ও-কার' হবে না। যেমন আজও, কালও, সেদিনও, এখনও, আজই, এখনই।

(চ) 'আর' শব্দটির একাধিক মানে আছে। আমাকে আর ভাত দিয়ো না। আমাকে আর একটু দাও। সে আর আসবে না। সে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে আরোই ঘাবড়ে গেল। রাম আর শ্যাম দুই ভাই।

৬. (ক) 'কী'— প্রশ্নবাচক সর্বনাম। কীসে, কীসব, কীজন্য, কীবা (কীবা তার রূপ), কীসের জন্য, কীরূপে, কী করে— লেখা হবে। যেমন— খাজনা দিব কীসে। কীসব হাবিজাবি এনেছ। কীজন্য এসেছ। কীসের জন্য এত আয়োজন। কী করে এমন হল। 'কি' প্রশ্নবাচক অব্যয়। যার উত্তরে সাধারণত 'হ্যাঁ' অথবা 'না' হয়। যেমন— কিন্তু তুমি যাবে কি? সে কি আসবে?

(খ) তাই— সে কারণে। 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর'। তা-ই— সেটাই। যা ধরবে তা-ই দুর্মূল্য।

৭. (ক) শব্দশেষের বিসর্গ হবে না। (অধঃ— বিসর্গ থাকবে), সদ্যোজাত, মনস্কামনা, মনঃসংযোগ, মনোযোগ, নিশ্ছিদ্র, সদ্যঃপ্রবষ্টি সদ্যঃস্নাত প্রভৃতি প্রচলিত বানান থাকবে। নভশ্চর যেমন হবে, তেমনই হবে বাংলা সমাস নভচর, মনপবন, মনমাঝি।

(খ) 'ছন্দ' শব্দে বিসর্গ কিংবা সন্ধিতে ও-কার হবে না। ছন্দবিজ্ঞান, ছন্দপতন, ছন্দচিন্তা, ছন্দশাস্ত্র, ছন্দজ্ঞান লেখা হবে।

৮. সন্ধি হলে 'ং' হবে। অভিধানে অবশ্য বিকল্পের চিহ্ন দেখানো থাকবে। সংগীত, সংগত, সংকল্প, অলংকার, অহংকার। গঙ্গা, সঙ্গে, সঙ্গী, অঙ্গ, অঙ্ক, বঙ্গ, প্রভৃতি সন্ধি না-হওয়া শব্দে কখনোই 'ং' হবে না।

৯. অসংস্কৃত শব্দে শব্দান্তে 'ং' হবে। রং, ঢং, শিং, দার্জিলিং। কিন্তু স্বরধ্বনি যোগ হলে 'ঙ' হয়ে যাবে। রঙের, শিঙের, শিঙি (মাছ)। বাংলা— বাঙালি। এবং, বরং, সুতরাং বানান থাকবে। পঙ্‌ক্তি— লেখা হবে।

১০. অসংস্কৃত শব্দে 'ৎ' হবে না। হিম্মত, হজরত, স্যাঙাত, রায়ত, ইমারত, মহরত, নেহাত, তফাত, মেরামত, বসত, নিজামত, খেসারত। ধ্বন্যাত্মক শব্দে 'ৎ' হবে। ফটাৎ, ধপাৎ, খটাৎ।

১১. নীচের শব্দগুলিতে 'জ' হবে।

জুঁই, জাঁতি, জা, জাদুকর, জহর, জোগান, জোগাড়, জাঁতা, জোয়াল, জোয়ান, জেরা, ওজোন, জোয়ার প্রভৃতি।

১২. সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতমূল শব্দ ছাড়া 'ষ' হবে না। মানুষ, ষাঁড়, ষোলো, মোষ, শিষ (শীর্ষ)।

১৩. সংখ্যাবাচক শব্দ এগারো থেকে আঠারো—ও-কার হবে। এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো। এক-শো, দু-শো, তিন-শো, চার-শো, পনেরো-শো,—ও-কার হবে। শ-খানেক, শ-তিনেক, শতখানেক— ও-কার হবে না।

১৪. নীচের শব্দগুলিতে 'স' হবে।

উপোস, ফাঁসা, গরাস, দস্যি, নস্যি, নিরেস, ঘুস, ঘুসি, সরেস, শাঁস, সাবান, সাগু, সফেদ।

(সংক্ষেপিত)

Bengali (MIL)
Class-IX

Time : 3 hours

Marks : 100

Unit	Sub-unit/Lesson	Marks
	Textbook : সাহিত্য-সৌরভ (নবম শ্রেণি)	
	Group-A : বাধ্যতামূলক	
	গদ্যাংশ	
1.	প্রত্যুপকার	10
	পিতৃস্নেহ	
	ভারতপথিক রামমোহন রায়	
2.	পরিবেশ দূষণ	8
	অসমের বাদ্যযন্ত্র	
	জাগ্রত দেবতা	
3.	অ্যান্টিবায়োটিক	7
	ছুটি	
	পদ্যাংশ	
4.	গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা	10
	কবর	
	সাধক	
	খাই-খাই	
5.	মনসামঙ্গল	10
	ধূলামন্দির	
	কাশীরাম দাস	
6.	ব্যাকরণ ব্যঞ্জন সন্ধি, নির্দেশক প্রত্যয়, স্ত্রী প্রত্যয়, বিশিষ্টার্থক শব্দ, বাক্যসংকোচন, বাক্যসম্প্রসারণ,	10
7.	ভাব-সম্প্রসারণ অথবা আবেদন-পত্র লিখন	4
8.	রচনা	8
9.	দ্রুতপঠন (রামের সুমতি, জলে-ডাঙায়)	8

Group-B : বৈকল্পিক

10.	**গদ্যাংশ**	10
	আত্মকথা	
	ভারতবর্ষ	
11.	**পদ্যাংশ**	
	আমরা	8
	আগামী	
12.	ব্যাকরণ	
	বিপরীত লিঙ্গবাচক শব্দ, কৃৎ প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়, ক্রিয়াপদ,	
	বাক্যসংকোচন,	7
	উক্তি পরিবর্তন	

* *বাংলা বিষয়ের অংশ হিসেবে Sanskrit (Group-C) পড়তে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের Riju Bharati পুস্তকখানি পড়তে হবে।*